বন্ধু চেনা বিষম দায় !

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

★

শ্রীশৈল চক্রবর্তী

বিচিত্রিত

রীডার্স কর্ণার
(গ্রন্থবিহার)
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

বন্ধুবরেষু

বন্ধু চেনা বিষম দায়!

বন্ধু চেনা বিষম দায়!

ট্রেন একটা ষ্টেশনে দাঁড়িয়েছে। আমার কামরায় আমি একলা। মুখ বার করে বাইরের শোভানিরীক্ষণ করার চেষ্টা করছিলাম—কিন্তু কী আর দেখব? সমস্ত চীনেম্যানের মত সব ষ্টেশনের একই সৌন্দর্য! সেই একই রেলিং, এক ঢঙের বাড়ী, একজাতীয় ষ্টেশন মাষ্টার, এক ধরণের যাত্রীরা, এমন কি, লক্ষ্য করে দেখেছি, প্রত্যেক ষ্টেশনে গার্ড সাহেবও এক! 'গরম চা' —'পান বিড়ি সিগারেট'—এমন কি, ঘণ্টাধ্বনি পর্যন্ত একরকম!

দৃশ্য কিম্বা শ্রাব্যের কিছু নূতনত্ব ছিল না। নূতনত্বের মধ্যে আমার কামরায় একটি নতুন আমদানি দেখা গেল। গাড়ী ছাড়বার আগে, সুটকেস হাতে হন্তদন্ত হয়ে এক ভদ্রলোক প্রবেশ লাভ করলেন।

ভদ্রলোকের গায়ে দামী কোট—অবস্থাপন্ন বলে' সন্দেহ হয়। সুটকেসটা বাদামী, কিন্তু তাহলেও ভারগর্ভতা থেকে তার সারগর্ভতা আন্দাজ করা অমূলক হবে না।

সুটকেসটি বঙ্কে রাখার পর আমি তাঁর চক্ষে পড়লাম।

"এই যে! অনে—ক দিন পরে!" তিনি বল্লেন। দর্শন মাত্রই আমাকে যে তিনি চিনতে পেরেছেন তার চিহ্ন তাঁর মুখে সকালবেলায় সূর্যকিরণের মত ছড়িয়ে পড়ল।

"এই যে! অনে—ক দিন পরে!" আমিও পুনরুক্তি করেছি। যদিও অনেকদিন পরে যে, এবিষয়ে দ্বিরুক্তি করার কিছুই ছিল না।

সতর্ক হয়ে বস্‌তে হয়। একেই আমার চোখ খারাপ, উপাদেয় দ্রষ্টব্য ছাড়া আর কিছু এই পোড়া চোখে পড়তেই

চায় না, তার ওপরে রাস্তায় ঘাটে অচিন্ত্যনীয় দেখা-সাক্ষাৎ লেগেই আছে।...চোখের দোষ নয়, লোকেরও কোনো দোষ দিই না—ও আমার কপালের দোষ !

তবু একটু সতর্ক থাকা দরকার, কি জানি, যদি আলাপের ত্রুটিতে বিলাপের কোনো কারণ ঘটে যায় ! তবে আমি চালাক ছেলে ! এরকম ক্ষেত্রে অপর পক্ষ 'আপনি' বলে' সম্বোধন করলে আমিও 'আজ্ঞে' বল্‌তে কসুর করি না, সে 'তুমি' বলে' সুরু কর্‌লে আমিও তখন, 'তুমি' চালাই, আর সে যদি 'তুই তোকারি' আরম্ভ করে' দেয়—তখন আমাকেও বাধ্য হয়ে—কি করব ?—আমিও ছেড়ে কথা বলবার পাত্র নই তো !

নিশ্চয় আগে চিনতাম—হয়তো খুব প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতাই ছিল এককালে—কিন্তু এখন আর চেনা যাচ্ছে না—এমন লোকের সঙ্গে নতুন আলাপ জমানো যে কী মুস্কিল ! অনেক সময়ে আবার এমন দুর্ঘটনাও ঘটে,—সর্বদাই যে আপনি-তুমির সমস্যা আপনা-আপনি ফয়সলা হবার সুযোগ পায় তা হয় না—অনেক সময়ে এমন হোলো যে আক্রমণকারী কোনো মতে ধরাছোঁয়াই দিল না—কোনো প্রকার সম্বোধনের ধার দিয়েই ঘেঁষল না একদম্ ! তখন অগত্যা ভাববাচ্যেই সারতে হয় আগাগোড়াঃ যথা, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?' 'কোথায় থাকা হয় আজকাল ?' 'বাড়ীর সবাই বেশ ভাল তো ?"......ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি নড়ে চড়ে বসি, সম্বোধনের গতি দেখে আলাপের বিধি করতে হবে—এবং যদি সম্ভব হয়, আলাপ-সালাপের

ভেতর দিয়ে তেমন যদি কোনো সূত্রপাত দেখি, লোকটাকে হয়ত পুনরাবিষ্কারও করতে পারি।

আপাদমস্তক উদগ্রীব হয়ে রইলাম—আমার নব-আলাপিতের নৈঋৎ কোণ থেকে অজ্ঞাতপূর্ব পরিচয়ের নতুন কোনো ঝড় আসে কিনা তার জন্য চোখকান খাড়া করে'।

নিদারুণ ভাবে কোলাকুলি করে' ভদ্রলোক আমার সামনে বস্‌লেন।—"আশ্চর্য! এভাবে যে দেখা হবে কে ভাবতে পেরেছিল?" বল্লেন তিনি।

সত্যি! কে একথা ভেবেছিল, আমি ভাবলাম। আমিও ভাবতে পারিনি! "আশ্চর্যই তো!" আমিও বলতে বাধ্য হলাম।

"একটুও বদলাও নি তুমি।" সে বল্ল।

"তুমিও ত প্রায় সেই রকমের আছো।" আমি বল্লাম, বেশ অন্তরের সঙ্গে সায় দিয়েই বল্লাম। সত্যি বল্‌তে, সম্বোধনের বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হবার সাথে সাথে তার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অন্তরঙ্গতাও বোধ করছিলাম যেন। ঘাড় থেকে, বল্‌তে কি, যেন একটা ভার নেমে গেছল! যদিও নতুন একটা গন্ধমাদন এসে চাপ্‌লো, তাহলেও, তুমিত্বের মধ্যে ওকে লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার আমিত্বও যেন আমি ফিরে পেলাম—

"তবে তুমি যেন একটু মোটা হয়েছ আগের চেয়ে—" সমালোচকের দৃষ্টিতে ও আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছাখে।

"হ্যাঁ, একটু।···কিন্তু তোমাকেও তো বড়ো রোগা দেখছিনে হে!" ওর অভিযোগ মেনে নিলেও, ওর স্থূলত্বের

মধ্যেই আমার অপরাধের অনেকখানি সাফাই যেন রয়ে গেছে বলে' আমার মনে হয়।

"মোটা হওয়া কিছু দোষের নয়,—আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের আয়তনও বাড়ে। কিন্তু ছেলেবেলায় তুমি কী রোগাই না ছিলে, ইস্! হাওয়ায় যেন উড়তে! অবিশ্যি, লঘুত্বে আমিও তখন কিছু কম যেতাম না!······যাক্ গে!···" অতীতের আর বর্তমানের—আমাদের ব্যক্তিগত অপরাধ ও মার্জনার চোখে দেখতে চায়।

আমিও আর শরীরের দিকে নজর দিই না! "যেতে দাও।" বলে' দুজনের সমবেত ওজনকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিই।

এই সব বাক্যালাপের ফাঁকে-ফোকরে লোকটাকে আন্দাজ করার চেষ্টা পাই, কিন্তু মুস্কিল এই, মানুষের মুখই যে শুধু আমি ভুলে যাই তাই না, তাদের নামও আমার স্মরণে আসে না—এমন কি, কোথায় যে কোন মূর্তিমানকে কোন অশুভক্ষণে প্রথম দেখেছিলাম তাও কিছুতে মনে পড়তে চায় না। তাছাড়া পোষাক-পরিচ্ছদ থেকে কারো যে থই পাবো তারই বা যো কী! কে আর কার সাজসজ্জা কোন্ কালে খুঁটিয়ে দেখেছে? কিন্তু এই সব খুঁটিনাটি বাদ দিলে প্রত্যেককে আমি বেশ ভালো রকমই চিনতে পারি। এবং এজন্য আমার যথেষ্ট গর্ব আছে।

যাক্। নাম আর চেহারা মনে না এলেও কিছু আসে যায় না—কেবল একটু হুঁসিয়ার থাকলেই হয়। কথাবার্তার খেই ধরে থাক্তে পারলেই খেয়া পার হওয়া যায়। এক্ষেত্রেও আমাকে একটু তৎপর হয়ে থাকতে হবে। এবং তা পারলেই,

এই আলাপ-পারাবার শেষ পর্যন্ত ঠিক উৎরে যাব, সন্দেহ নেই।

"উঃ, কদ্দিন পরে এই দেখা!" ওর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

"বহুৎদিন।" ক্ষুণ্ণকণ্ঠে আমি জবাব দিলাম। তার বিরহে আমিও যে নিতান্ত সুখে ছিলাম না, বিষণ্ণতার আমেজ এনে ওকে সমঝাতে চাইলাম।

"কিন্তু দিনগুলো দেখতে দেখতে কেটে গেছে।"

"ঠিক বিদ্যুতের মতো।" আমি সায় দিই।

"আশ্চর্য!" ও বল্‌তে আরম্ভ করল—"জীবনের কথা ভাবলে অবাক্ হতে হয়। বছরের পর বছর কি করে' যে দেখতে না দেখতে কেটে যাচ্ছে—" সে দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে।

"ভালো করে' দেখতে না দেখতেই।" আমি ওর দীর্ঘনিশ্বাসে যোগ দিই: "বাস্তবিক, ভাবলে তাক্ লাগে।"

"কেটে যাচ্ছে আর পুরাণো বন্ধুদের কোথায় যে আমরা হারাচ্ছি! কোথায় যে ওরা গেল, অনেক সময়ে আমি ভাবি।"

"আমিও।" আমি বলি। কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে কি, ভেবে কোনো কূলকিনারা পাই না। বস্তা বস্তা লোক সব গেল কোথায়? কোন্ অবস্থার মধ্যে গেল? মারা গেল, না, খোয়া গেল? না, নিরুদ্দেশেই বেরিয়ে গেল বিজ্ঞাপন না দিয়ে? নাকি, সবাই পণ্ডিচেরিই চলে গেল বিনা নোটিশে?

"তুমি কি সেই পুরণো আড্ডায় যাও আর?" সে জিজ্ঞেস করে।

"কক্ষনো না।" আমি সুদৃঢ়তার সহিত বলি। স্পষ্টই

একথা জানিয়ে দি। এবিষয়ে কোনো সংশয় রাখা ঠিক না—যতক্ষণ না, কোথাকার সেই পুরাণো আড্ডা, তার ঠিকানা পাচ্ছি, তাকে যথাস্থানে স্থাপন করতে পারছি ততক্ষণ কোনো আলাপ-আলোচনার মধ্যেই তার উত্থাপন হতে দেয়া উচিত নয়।

"তাই।" সে বলে' চলে: "আমিও জানতাম যে তুমি আর সেখানে যেতে চাইবে না।"

"আজকাল আর যাইনে।" গদ্‌গদ স্বরে আমি জানাই।

"বুঝতে পারছি। বিশেষতঃ সেই বিচ্ছিরি কাণ্ডটা ঘটবার পর কি করেই বা যাবে! যাক্, ঐ প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপনের জন্যে আমি দুঃখিত। তুমি আমায় মাপ করো।" অনুতপ্ত কণ্ঠে ও আমার মার্জনা ভিক্ষা করে।

আড্ডাঘটিত দুর্ঘটনার পরিমাপ করতে না পারলেও ওকে আমি মাপ করে' দিই। পুরাণো স্মৃতির পূর্বক্ষতমূলে পুনরাঘাত লাভ করে' মুখ চূণ করে' থাকি। আশানুরূপ আমাকে মর্মাহত হতে হয়—কি করব?

ক্ষণিক স্তব্ধতার পর আবার ও সুরু করে: "মাঝে মাঝে পুরোণো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়। তারা তোমার কথা জিগেস করে। তুমি কী করছ জানতে চায়।"

"হতভাগারা!" আমি মনে মনে বলি—মুখ ফুটে বলতে সাহস পাই না।

"তাদের ধারণা তুমি একেবারে গোল্লায় গেছ!"

এবার আমার রাগ হয়। বারম্বার আহত হয়ে আমিও মরিয়া হয়ে উঠি। পাল্টা আক্রমণ চালাতে প্রস্তুত

হই। অন্যান্য ক্ষেত্রে, আগের আগের বারে যেসব ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছি তারই একটা নিক্ষেপ করি এবার।

"ভালো কথা!" আমি উদ্দীপ্ত হয়ে বলি: "আমাদের কেলোর কি খবর?"

এ অস্ত্র যে অব্যর্থ, আমার জানা। প্রত্যেক দলেই একটি করে' কেলো থাকে। থাকবেই। কেলো, কালু, কালো, কেলে—নামকরণের প্রকারভেদে—ঘোরতর কৃষ্ণকায়—উক্ত বিশেষ্য পদবাচ্য কেউ না কেউ—না থেকেই যায় না।

"ওঃ! কেলো! সে এখন মলঙ্গা লেনের কোন্ এক আপিসে চাকরি করে। ইয়া মোটা হয়েছে—পাক্কা আড়াই মণ—তার ওপরে আবার রঙের যা খোল্তাই—যদি দেখতে! তাকে আর চেনাই যায় না! তুমি অন্ততঃ চিনতে পারবে না।"

নিশ্চয়ই না, সেকথা আমি হলপ করে' বলতে পারি। এখনই এবং এখানেই—না দেখেই। অতঃপর আবার একটা শরসন্ধান কর্লাম—"হ্যাঁ, আমাদের পদা! পদা কী করছে?"

"পদা? কোন্ পদা? তুমি বুলুর ভাই পদার কথা বল্ছ?"

"হাঁ, বুলুর ভাইই তো! বুলুর ভাই পদার কথাই বলছি। প্রায়ই তার কথা আমার মনে পড়ে।"

কোনোরকমে সামলে নিই! প্রত্যেক বনেদী বন্ধুগোষ্ঠীতেই পদা বলে' কেউ থাকে—পদস্থ ব্যক্তি কেউ না কেউ থাকবেই। আমাদের পুরোণো দলটাতেও তার ব্যতিক্রম থাকা উচিত হোতো না। পদাকে না ধরতে পারলে আমি নিজেই ধরা পড়ে বিপদে পড়তাম যে!

"পদার কোনো খবর নেই। তবে তার দাদা, মানে বুলু, সিভিক গার্ড হয়েছে। এ-আর-পি হবার চেষ্টা করেছিল খুব, কিন্তু হতে পারল না।"

"দুঃখের বিষয়!" আমি সহানুভূতি প্রকাশ করি। "খুবই দুঃখের বিষয়। তবে যা দিনকাল পড়েছে—রাস্তার একটা ফিরিওলাও সহজে হওয়া যায় না।"

"বিশের সংবাদ শুনেছ বোধহয়? তার সেই একমাত্র—তাঁকে চিনতে তো? বড্ড শোক পেয়েছে বেচারা। যদিও খুব বৃদ্ধ বয়সেই গিয়েছেন, দুঃখের কিছু নেই, তবুও সে ভারী কাতর হয়ে পড়েছে।"

বিশের শোকে আমিও বিশেষ ব্যথা পাই, অকাতর থাকতে পারি না। মৃত্যুমাত্রই শোকাবহ, বিশেই কি আর বিয়াল্লিশেই কি, আর বাহাত্তরে হলেই বা কম কিসে! কিন্তু লোকটা কে? মানে, বিশের সম্পর্কে কে? বাবা নয় নিশ্চয়—বাবা তো একমাত্রই হয়—মায়ের মাত্রাও ঠিক তাই। —তাহলে? ছোট ভাইরা কিছু বিশের চেয়ে বেশি বুড়িয়ে মরতে পারে না। এ তবে কে রে বাবা?

যিনিই হোন্, আন্দাজের ঢিল ছুঁড়ি। "হ্যাঁ, চিনতাম বই কি! দস্তুরমতই ভাব ছিল আমার সঙ্গে। বুড়ো বয়স পর্যন্ত তো বেশ টনকো ছিলেন—দেখেছি বই কি! আহা—তাঁর সেই দিব্যকান্তি এখনো আমার চোখে ভাসছে। আর ওঁর সেই হুঁকো টানা। আহা, তামাক খেতে কী ভালোই না বাসতেন!"

"হুঁকো? বিশের পিসিমা হুঁকো টান্‌তেন? বল্‌ছ কি তুমি?" নিজের কানকে ও যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

"বিশের কোন্ পিসী? আমি ওর কোনো পিসীকে চিনিনে তো। আমি ওর পিসের কথাই বল্‌ছি।"

"ওর পিসেকে কেউ কখনো চোখে দেখেনি। বিয়ের রাত্রেই তো তিনি পালিয়ে যান।"

"কোন্ বিশে বল তো?" ডুববার মুখে আমি শেষ তৃণটি পাক্‌ড়াই—"আমার কেমন গোলমাল হচ্ছে।"

"ও, বুঝেছি! তুমি আমাদের বিশুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছো। হ্যাঁ, তাদের বাড়ীতে একজন হুঁকোখোর আছেন বটে! তিনি ওর পিসে বুঝি? তাতো জানতুম না—তাহলে ঠিকই হয়েছে। না, তিনি মারা যান্‌নি—এখনো সমানে হুঁকো টেনে চলেছেন।"

"আঃ, শুনে বড়ো সুখী হলাম।" আমি বলি। বিশে এবং বিশুর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে জেনে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

"এর পরের ইষ্টিশনই রাণাঘাট—তাই না?" আমার বন্ধু হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে ওঠেন—"রাণাঘাট অব্দি টিকিট কেটেছি—কিন্তু এখন ভাবছি কল্‌কাতাই চলে যাই। এখানে গাড়ী থামলেই চট্ করে' নেমে টিকিটটা কিনে আনা যাবে—কি বলো?"

আমি ঘাড় নাড়তেই তৎক্ষণাৎ উঠে তিনি পকেট হাতড়াতে আরম্ভ করলেন—তাঁর নিজের পকেট। "যাঃ, সুটকেসের চাবিটা আবার কোথায় ফেল্লুম? কী সর্বনাশ, ওর মধ্যেই আমার

সব টাকাকড়ি যে! দেখি, তোমার চাবিটা দেখি, আমার কলে লাগে কি না দেখা যাক্!"

আমার স্যুটকেসের চাবিটা ওকে দিলাম—কিন্তু সে লাগ্‌তে রাজি হয় না—কোনোমতেই না। ইতিমধ্যে রাণাঘাট কিন্তু এসে হাজির হয়।

"খুচরো টাকা কয়েকটা দাওতো ভায়া, টিকিটটা কিনে আনি।" ও বলে: "শেয়ালদায় নেমে, ভেঙে হোক্ যা করে' হোক্ এটা তো খুলতে হবে। তখন তোমায় দিয়ে দেব—কেমন?"

বন্ধু হয়ে বন্ধুর এটুকু উপকার না করা ভাল দেখায় না—কটা টাকাই বা আর? আমি মণিব্যাগটার মুখ খুলি—একটু ফাঁক করি মাত্র—কিন্তু ওর আর তর সয়না, উত্তেজনার মুখে গোটা মণিব্যাগটাই হস্তগত করে তিনি নেমে পড়েন।

যাক্। এক্ষুণি তো ফিরে আস্‌ছে ফের! নাকের বদলে নরুণ—আমার ছোট মণিব্যাগের বদ্‌লি ওর এই বৃহৎ স্যুটকেসটাই যখন জমা রেখে গেছে তখন আর ভাবনা কি? নরুণের বদলে মৈনাকই বরং বলতে হয়।

আমি মুখ বাড়িয়ে দেখি, ও টিকিটঘরের দিকে চলেছে, কিন্তু যেরকম ঢিমেতেতালায় চলেছে, আমার ভয় হয়, ট্রেন না ফেল করে' বসে! তবে এখানে গাড়ী একটু বেশীক্ষণ দাঁড়ায়, এই যা!

গাড়ী প্রায় ছাড় ছাড়, কিন্তু বন্ধুর আমার দেখা নেই। একি, ওর মালপত্তর আমার হেফাজতে ফেলে—ও আবার গেল কোথায়? এমন সময়ে আরেক ব্যক্তি কামরার দরজা খুলে ঢুকলেন।

"এই যে! এই যে!" সেই ব্যক্তি বল্লেন। তাঁরও বদনমণ্ডলে পূর্ব পরিচয়ের চুশ্চিহ্ন—সেই অপূর্ব হাসি। অবিকল আগেকার অভিব্যক্তি!

আমি তটস্থ হয়ে পড়ি। কিন্তু না, এ হাসি 'আমাকে দেখে নয়—আমার বন্ধুর স্যুটকেসটি দর্শন করেই! ওটিকে হাতেনাতে পাক্‌ড়ে উনি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন :

"এই যে! এখানে ফেলে রেখে গেছে হতভাগা। বন্ধুদের কাউকে যদি বিন্দুমাত্র বোঝা যায়! বুঝব কি, চিনতেই পারা যায় না। দুঃখের কথা আর কি শুনবেন—আমি আপ্‌ ট্রেনে যাবো মশাই, কিন্তু এই ডাউন ট্রেনে আমায় যেতে হচ্ছে। শিলি-গুড়ির বদলে কলকাতায় যাবার আমার একটুও ইচ্ছা ছিল না! কিন্তু এমনি গ্রহের ফের, পোড়া দা ইষ্টিশনে দার্জিলিং মেলের জন্য অপেক্ষা করছি এমন সময়ে এক পুরাণো বন্ধুর সঙ্গে মুলাকাৎ! ছেলেবেলার কোনো বন্ধু নিশ্চয়, চেনাই যায়না একদম্‌। সে আমায় কিন্তু বেশ চিনেছে, তবে আমি যে তাকে চিনতে পারিনি মোটেই তা আমি তাকে বুঝতে দিই নি! গাড়ী ছাড়বার মুখে বন্ধুটি ভুল করে' তার নিজের মনে করে' আমার ব্যাগটি নিয়ে উঠে পড়লেন! কি করি, আমিও এই গাড়ীতে উঠে তখন থেকে প্রত্যেক ষ্টেশনে নেমে নেমে কামরায় কামরায় বন্ধুটিকে গোরু খোঁজা করে' বেড়াচ্ছি—কিন্তু গাড়ীও কি ছাই এধারকার ইষ্টিশনগুলোয় এক মিনিটের বেশী দাঁড়ায়!" বক্‌তে বক্‌তে ব্যাগ হাতে ব্যগ্র হয়ে তিনি নেমে পড়লেন—গাড়ী ছাড়বার ঠিক আগের সেকেণ্ডে।

গোল দীঘির
ভারী গোল!

লোকে যে বলে বন্ধুর মতো আর হয় না—তা ঠিক।

সেই দিনই সকালে শেয়ালদায় নেমেছি—সেই প্রথম আমার কলকাতায় আসা। সিনেট হলে আমার পরীক্ষার সিট্ পড়েছিল, বাড়ীটা আবিষ্কার করার দরকার। কিন্তু পাছে কেউ পাড়াগেঁয়ে মনে করে সেই ভয়ে কাউকে ডেকে জিগেস করতে সাহস হচ্ছিল না।

যেদিকে হুচোখ যায়, ঘুরতে ঘুরতে চলেছি। রাস্তার ধারে ধারে বাড়ীর গায়ে গায়ে লম্বা চওড়া সাইন্‌বোর্ড লাগানো—সেগুলো পড়ছি—কিন্তু সিনেট হলের কোনো বিজ্ঞাপন কোথাও নজরে পড়ছিল না।

শুনেছিলাম, গোলদিঘীর ধারে নাকি সিনেট হল্! কিন্তু সে গোলদিঘীটা যে কোথায় কে বলবে!

এত ঘুরপাক খেয়ে গোলদিঘীর কোনো কিনারা করতে না পারলেও, অবশেষে এক চৌকো দিঘীর কিনারে এসে পড়লাম। তার চারধারে এক চক্কর মেরে এক ধার দিয়ে বেরুতেই মোটা মোটা থাম্‌ওয়ালা প্রকাণ্ড এক বাড়ী সামনে পড়ল। কার বাড়ী কে জানে, নিশ্চয় কোনো হোমরা-চোমরা লোকের বাড়ী হবে।

কি ভাগ্যি, বাড়ীটার কাছাকাছি পৌঁছেই এক পুরোণো বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বন্ধুর মতো হয় না, সাধে কি বলেছি? ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় মজুত থাকতে ওদের জুড়ি নেই। শ্মশানে, মসানে, নেমন্তন্নবাড়ীতে—প্রায় সব জায়গাতেই যথাকালে দেখা যায় বলেই তো বন্ধু! অবিশ্যি, শ্মশানে দেখা গেলেও আমি—মানে, যে মারা গেছে—তাকে দেখতে পাই না। কিন্তু

তাহলেও, এবং তাছাড়া, ধার দেবার এবং ধার শোধ দেবার সময়ে দেখা না পেলেও, বন্ধুকে বন্ধু বলতে আমার বাধা নেই।

"আরে, তুই এখানে! তুই এখানে কী করছিস্?" প্রথম সম্ভাষণেই আমার বিস্ময়প্রকাশ!

"দেখছিস্‌নে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছি।" সে জবাব দেয়।

"তা বটে। হাওয়া খাবার জায়গা বটে।" আমি সায় দিয়ে বলি। সত্যি বল্‌তে, এত গলি-ঘুঁজির মধ্যে ভ্যাবাচাকা খেয়ে এই প্রথম এই পুকুরের পাড়ে এসে হাঁফ ছাড়বার মতো একটু ফাঁকা পেলাম।

"তা, তুই হাওয়া খা।" আমি তাকে বলি: "তোর ঠিকানাটা দিস্—সময়মত দেখা করব'খন। এখন তুই আমাকে একটা রাস্তা বাৎলে দিতে পারিস্? গোলদিঘী যাওয়ার রাস্তা?"

"সে আর শক্ত কি! এই নাক বরাবর চলে যা। কোনো দিকে না তাকিয়ে চল্‌তে থাক্।" আমার বন্ধু বাৎলায়: "সোজা দক্ষিণমুখো এই ট্রাম্ লাইন্ ধরে' বেশ খানিক হাঁট্‌লে বৌবাজার পাবি। ঐ নামেই বৌবাজার! বৌ কিম্বা বাজারের পাত্তা পাবিনে। সেটা পার হয়ে সটান্ চলে যা—আরো সাম্‌নে—ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্ ধরে' যতটা পারিস্। ডানদিকে অনেক সন্দেশের দোকান পড়বে, ভীম নাগ ইত্যাদি নামের, কিন্তু ভুল করে' যেন চাখিস্ টাখিস্ নে।"

"কেন, চাখ্‌ব না কেন? সন্দেশ চাখ্‌লে কী হয়?" আমি জিগেস করি। বল্‌তে কি, সন্দেশের কথা শোনার পর থেকে

গোলদিঘীর রাস্তাটা আর আমার কাছে ততটা খারাপ লাগে না। তেমন আর দুর্গম বা শ্রমসাধ্য বলে মনে হয় না। বরং বেশ একটু মিষ্টি মিষ্টিই লাগতে থাকে।

"সন্দেশ চাখ্‌লি কি গেলি! তাহলেই পথ ঘাট সব তুই গুলিয়ে ফেল্‌বি। সন্দেশের লোভে ঐখানেই ঘুর্ ঘুর্ করবি সারাদিন। তোকে তো আমি জানি!"

"না, তাহলে চাখব না। গোলদিঘী আমায় যেতেই হবে। আজকেই আমার গোলদিঘীর ধারে গিয়ে পৌঁছানো দরকার।" আমি জানাই।

"তাহলে ভুল করেও সন্দেশের দিকে তাকাস্ নে। বাঁদিকে হিদারামের গলি পাবি—তাই দিয়ে কেটে পড়তে পারিস্—যদি নিতান্তই সন্দেশের প্রলোভন সম্বরণ করা শক্ত বলে' তোর মনে হয়।"

"হিদারামের গলি। অদ্ভুত নাম তো।" আমার আশ্চর্য লাগে।

"তুই ও-পথ দিয়ে গলবার পর আর হিদারাম থাকবে বলে' বোধ হয় না। হাঁদারামের গলি হয়ে যাবে। তুই পা দিলে গলিটার নাম পাল্‌টে যাবে বলেই আমার ধারণা।"

শুনে আমি দুঃখিত হই। আমার জন্যে কারো বদ্‌নাম হওয়া আমি পছন্দ করি না। ও-পথে পা বাড়াব কিনা ভাবি। কিন্তু একান্তই যদি ও-পথ দিয়ে না গেলে গোলদিঘী বিরল হয় তাহলে বাধ্য হয়েই আমাকে যেতে হবে, উপায় কি? রাস্তাটার নামান্তর-লাভের আশঙ্কা থাকলেও যেতে হবে।

"হাঁদারামই হোক্ আর হিদারামই হোক্, আমি গোলদীঘি যাবার শর্ট্‌কাট্ পেতে চাই। এই আমার সাফ কথা।"

"শর্ট্‌কাট্‌ই তো বল্‌ছি রে। তবে যেতে একটু ঘুর হবে। অনেকগুলো রাস্তা কিনা! তুই নোট্‌বুক্ বার করে' রাস্তার নামধামগুলো লিখে নে—আমি বলে' বলে' যাই। টুকে না নিলে তোর মনে থাকবে না। তোর যা মেমারি।"

"তা যা বলেছিস্।" আমি বলি। আমার বিস্মরণশক্তি এতই অসাধারণ যে আমার তা অজানা নয়। তারপর আমি টুক্‌তে থাকি আর ও বল্‌তে থাকে ঃ

"হিদারাম ব্যানার্জির লেনে ঢুকেই ডানহাতি যে গলি পাবি তাই ধরে' একটু গেলেই আসবে বাঞ্ছারাম অক্রুরের লেন। সেটা দিয়ে যেতে যেতে ডানদিকে আরেকটা লেন্ পাবি—"

"অতো লেনদেনে আমার কাজ কি ভাই? আর আমার সঙ্গে এত ক্রূরতাই বা কেন করছিস্? আমি তো গোলদীঘিতে যাবো বলেছি।" বাধা দিয়ে আমি বলি।

"গেলেই বা! সোজা রাস্তাই তো বলছি তোকে। যেতে চাস্ যা, না যেতে চাস্ না যা—তোর খুসি। বল্‌ব—না,বল্‌ব না? তাহলে যেমন যেমন বলি—টুকে টুকে নে। তাহলে ওই বাঞ্ছারাম অক্রূর ধরেই চ—অতো অলিগলির মধ্যে গলাগলি করতে যদি না চাস্—তাহলে হাঁদারাম বাঞ্ছারাম সব ছাড়িয়ে ওই রাস্তা দিয়ে শশীভূষণ দে ষ্ট্রীটে পড়বি গিয়ে। শশীভূষণ দে ক্রস্ করে' সেন্ট্ জেম্‌স্ স্কোয়ার ভেদ করে' তোকে যেতে হবে—এবারে পাবি ডিক্‌সন্ লেন।"

আমি আর কোনো প্রতিবাদ করি না। এক ধার থেকে অলিগলির ডিক্‌সনারি টুকে যাই।

"ডিক্‌সন্ লেন হয়ে সারপেন্‌টাইন্ লেনে এঁকে বেঁকে বেশ কয়েক পাক খেয়ে ক্যাম্‌বেল্ হাঁসপাতালের সাম্‌নে গিয়ে পড়বি। তারপরে সাবধানে বাস্ টাস্ বাঁচিয়ে রাস্তা পেরুবি, বুঝেছিস্?—যদি হাঁসপাতালে যাবার তোর ইচ্ছে না থাকে। না কি, তুই হাঁসপাতালেই যেতে চাস্?—চাস্‌নে? তাহলে চলে যা, হাঁসপাতাল বাঁচিয়ে, তাকে ডান ধারে রেখে, একটু উত্তরমুখো যেতে পারলেই শেয়ালদা!"

"আরে! শেয়ালদা থেকেই তো এলাম। এই আসছি তো!" আমি না বলে' পারি না।

"এলেই বা! গোলদীঘি যেতে হলেও শেয়ালদা দিয়ে যেতে হয়। অবিশ্যি ট্রেনে আর তোকে চাপ্‌তে হবে না, শেয়ালদাকে পাশে রেখে বরাবর উত্তরপশ্চিমমুখো চল্‌বি—যেতে যেতে—"

আমি ওর কথামত টুক্‌তে টুক্‌তে যাই। যেতে যেতে হিয়াৎ খাঁ লেন হয়ে, পটলডাঙা পটিয়ে, পটল না তুলে, আমহার্স্ট স্ট্রীট্ ডিঙিয়ে, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের ভেতর দিয়ে, মেছোবাজার উৎরে—ঝামাপুকুরে গিয়ে পড়ি। সেখান থেকে বেচু চ্যাটুজ্যের গলিকে ধন্য করে', গুরুপ্রসাদ চৌধুরী গলিয়ে, একটু গেলেই সাম্‌নে পড়ে একটা গলি—কি নাম কে জানে—ব্লাইণ্ড লেন্ নয়—সেটা পার হয়ে গেলেই একেবারে সুখের স্ট্রীট্! উঁহু, সে সুখের নয়—এখনই এত সুখ কিসের? ওর নাম, কী বলে গিয়ে—সুকিয়া স্ট্রীট্—তাই ধরে আরো উত্তরমুখো গেলে বিবেকানন্দ রোড্—"

"বিবেকানন্দ রোড ! বাঃ, বেড়ে নামতো।" শুনে আমার একটু উৎসাহ হয়। "খাসা নাম !" আমার প্রণাম জানাই।... প্রাতঃস্মরণীয় নাম শুনে এতক্ষণে একটু আরাম পাই।

"হ্যাঁ, এবার সেইটে পেরিয়ে একটু গেলেই, রেলিং দিয়ে ঘেরা, গোলাকার এক দীঘি—"

"গোলদীঘি ! গোলদীঘি !!" আমি লাফাতে থাকি। অবিশ্যি, প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে লাফানো লজ্জার, হয়তো সুরুচিও নয়, কিন্তু তাহলেও বহু সাধ্যসাধনার পর বাঞ্ছিত বস্তু পেলে কে না লাফায় ? আমি একা নই, প্রাচীন আর্কিমিডিস্‌ও একদা 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' বলে' লাফিয়েছিলেন তার নজির আছে।

"মোটেই গোলদীঘি না।" ও মুচ্‌কি হাসে। "গোলাকার দীঘি হলেই গোলদীঘি হবে, একি তুই তোর অজ পাড়া গাঁ পেয়েছিস্ ? কলকাতার হালচালই আলাদা। দেখতে গোল হলেও সেটা গোলদীঘি নয়—গোলদীঘি এ বিষয়ে ভারী চালাক। ভারী হুঁসিয়ার, বুঝলি ? তাকে বেশ চৌকসই বলা যায় এ বিষয়ে।...গোলদীঘি এখনো ঢের দূর।"

"ঢের দূর !" আমার অস্ফুট আর্তনাদ বেরয়। কিন্তু উপায় কী, অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে এগুতে হয়। বিবেকানন্দ রোড্ থেকে বিবেক এবং আনন্দ লাভ করে' মানিকতলা হয়ে বীডন স্ট্রীট্, নিমতলা স্ট্রীট ইত্যাদি পথে একে একে পাচার হতে হতে একেবারে আমি গঙ্গার ধারে গিয়ে পড়লাম। পড়লাম এবং আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল : "ওব্‌বাবা ! গোলদীঘি যাওয়া তো সোজা নয় দেখছি।"

"সোজা ! সোজা কে বলেছে !" আমার বন্ধু বলেঃ "গোলদীঘি যেতে অনেক সময় লোক পাগল হয়ে যায়।"

"বলিস্ কী?" আমি ভয় খাই।

"মোটেই বাড়িয়ে বল্‌ছিনে। গোলদীঘি যেতে রাঁচি চলে যায় কতো লোক। তা বলে তুই যেন যাস্‌নে।...তুই আরেকটু কষ্ট করে' গেলেই তারপর, সামনেই গঙ্গা—বুঝেছিস্!" হাই তুলে ও বলে। এতগুলো রাস্তাঘাটের হদিশ দিয়ে বেচারাকে ক্লান্ত দেখা যায়,—তা, কাহিল হবার কথাই বটে, বলে টুক্‌তে টুকতে আমারই হাতে পায়ে খিল ধরে' গেলো !

"গঙ্গা সাঁৎরে পেরুতে হবে নাকি রে—গোলদীঘি যেতে হলে ?" ভয়ে ভয়ে আমি জানতে চাই।

"গঙ্গা পার হয়ে যে গোলদীঘি যাওয়া যায় না এমন কথা আমি বলি না।" ও বলে ঃ "গঙ্গা পেরিয়ে বোটানিক্যাল্ গার্ডেন ঘুরে, চিড়িয়াখানা চিড়ে, এমন কি, হাওড়া, আমতা, ডায়মণ্ড হারবার, এঁড়েদা পেরিয়ে হেঁটে হেঁটে টি-বি বানিয়ে যাদবপুর হাসপাতাল হয়েও গোলদীঘি পৌঁছনো যায়—"

"না না। আমার টিবি ফিবির দরকার নেই।" সন্ত্রস্ত হয়ে আমি বলি। "আমি শর্টকাট চাই বটে, কিন্তু অতো শর্টকাট না। তাছাড়া আমি গোলদীঘি যেতে চেয়েছি, স্বর্গে নয়, তা বোধহয় তোর মনে আছে ?"

"তা আর মনে থাকবে না !" ও ঘাড় নেড়ে জানায়।

তারপর গঙ্গার ধার দিয়ে আর এক প্রস্থ রাস্তাঘাটের নামধাম সে বাৎলায়। শুনে তো আমায় বসে' পড়তে হয়। হাতে

কলমে হলেও, এতখানি পথশ্রমে কে না কাবু হয়ে পড়ে বলো ?

"আরে, এখনই বস্‌লি ! এইখানেই বসে' পড়লি যে ? কেন পড়িস্ নি পাঠ্য বইয়ে—কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ ? উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ ?···ছিঃ ! ধিক্ তোকে !"

ওর ধিক্কারে নবোদ্যম লাভ করে' উস্‌কে উঠি। তৎক্ষণাৎ ওর কথামতো আর আমার নোট্ করা মতো হাঁটতে সুরু করে' দিই। সমস্ত দিন ঘুরে হড্ডা বড্ডা খেয়ে শ্রান্ত দেহে, সন্ধ্যের মুখে চীৎপুর পেরিয়ে পূবমুখো কলুটোলার রাস্তা ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছি, আস্‌তে আস্‌তে—আবার সেই সকালের থাম্‌ওয়ালা বাড়ীর সামনে এসে পড়লাম। চৌকো দীঘিটার সাম্‌নে—সেই থাম্‌ওয়ালা বাড়ীটা !

আর, কী আশ্চর্য ! ঠিক সেইখানেই আবার আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তেম্‌নি দাঁড়িয়ে সেখানে। কলাকার্তিক !

"তখনো তোকে দেখলাম, এখনো দেখছি। তখন থেকেই হাওয়া খাচ্ছিস্ নাকি এখানে ?" আমি অবাক হয়ে যাই।

"বারে, আমার যে এইখানেই কাজ ! ওই থামওলা বাড়ীটার ভেতরেই আমার চাক্‌রি যে ! তখন আসছিলাম, এখন যাচ্ছি। ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে।" বন্ধুবর জানায়।

"তা বেশ। কিন্তু আমাকে এত ভুল পথে ঘুরিয়ে নাহক্ হায়রান করে তোর কী লাভ হোলো শুনি ?" আমি বাজের মত ফাটি। আমার বেজায় রাগ হয়।

"তুই তো গোলদীঘিতে যেতে চেয়েছিলি, তাই না ? তাহলে

উজ্‌বুকের মতো চেঁচাচ্ছিস্ যে! ঠিক পথই তো তোকে বাৎলেছি। অতো গোল করছিস্ কেন? ওই তো, সামনেই তো তোর—ওই গোলদীঘি!"

এক নিশ্বাসের গল্প

বাড়ী পাওয়ার ভারী অসুবিধে। সারা বালিগঞ্জ ঘুরে ঘর না পেয়ে হয়রান হয়ে হরেকেষ্ট লেকের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছে—"আহা, এই তো চমৎকার আশ্রয়!" শেষ পর্যন্ত ওই জলের তলাতেই মাথা গুঁজে শান্তিলাভ করতে হবে কিনা ভাবছে মনে মনে।

এমন সময় ঝপাৎ—! জলে পড়ার একটা আওয়াজ কানে আসতেই সে ফিরে তাকালো; দেখলো তার বন্ধু নবকেষ্ট জলের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাকে বাঁচাবার চেষ্টামাত্র না করে তক্ষুনি সে একছুটে নবকেষ্টর বাড়ীওয়ালার কাছে গেল—

"নবকেষ্ট জলে পড়েছে। সাঁতার জানে না—এতক্ষণে বোধ হয় খতম্! তার ঘরখানা তো এবার আমায় দিতে পারেন?" হাঁপ ছেড়ে বল্ল ও।

"ভারী দুঃখিত হলাম।" জানালেন বাড়ীওলা: "যে লোকটা ওকে জলে ধাক্কা মেরে ফেলেছিল একটু আগেই তাকে ভাড়া দেয়া হয়ে গেছে। উপায় নেই।"

আমার
বাঘ-শিকার

মুখের দ্বারা বাঘ মারা কঠিন নয়। অনেকে বড়ো বড়ো কেঁদো কেঁদো বাঘকে কাঁদো কাঁদো মুখে আধমরা করে ঐ দ্বারপথে এনে ফেলেন। কিন্তু মুখের দ্বারা ছাড়াও বাঘ মারা যায়। আমিই মেরেচি।

মহারাজা বল্লেন—"বাঘ-শিকারে যাচ্ছি। যাবে আমাদের সঙ্গে?"

'না' বল্‌তে পারলুম না। এতদিন ধরে তাঁর অতিথি হয়ে নানাবিধ চর্ব্যচোষ্য খেয়ে অবশেষে বাঘের খাদ্য হবার সময়ে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলে না। কেমন যেন চক্ষুলজ্জায় বাধতে থাকে।

হয়তো বাগে পেয়ে বাঘই আমায় শিকার করে' বস্‌বে; তবু মহারাজার অমন্ত্রণ কী করে' অস্বীকার করি? বুক কেঁপে উঠলেও হাসি হাসি মুখ করে' বল্লাম—"চলুন, যাওয়া যাক্। ক্ষতি কী?"

মহারাজার রাজ্য জঙ্গলের জন্যে এবং জঙ্গল বাঘের জন্যে বিখ্যাত। এর পরে তিনি কোথাকার মহারাজা তা বোধহয় না বল্লেও চলে। বল্‌তে অবশ্যি কোনো বাধা ছিল না, আমার পক্ষে তো নয়ই, কেন না রাজামহারাজার সঙ্গেও আমার দহরম্-মহরম্ আছে—সেটা বেফাঁস হয়ে গেলে আমার বাজারদর হয়তো একটু বাড়তোই। কিন্তু মুস্কিল এই, টের পেলে মহারাজ হয়তো আমার বিরুদ্ধে মানহানির দাবী আনতে পারেন—এবং টের পাওয়া হয়তো অসম্ভব ছিল না। মহারাজা না পড়ুন, মহারাজ-কুমারেরা যে আমার লেখা পড়েন না এমন কথা হলফ্ করে' বলা

কঠিন। তাছাড়া আমি যে পাড়ায় থাকি, যে গুণ্ডাপাড়ায়, কোনো মহারাজার সঙ্গে আমার খাতির আছে ধরা পড়লে তারা সবাই মিলে আমাকে একঘরে করে দেবে। অতএব সব দিক্ ভেবে স্থান, কাল, পাত্র চেপে যাওয়াই ভাল।

এবার আসল গল্পে আসা যাক।

শিকার-যাত্রা তো বেরুলো। হাতীর ওপরে হাওদা চড়ানো, তার ওপরে বন্দুক হাতে শিকারীরা চড়াও—ডজন খানেক হাতী চার পায়ে মশ্ মশ্ করতে করতে বেরিয়ে পড়েছে। সব আগের হাতীতে চলেছেন রাজ্যের সেনাপতি। তারপর পাত্র-মিত্র-মন্ত্রীদের হাতী; মাঝখানে প্রকাণ্ড এক দাঁতালো হাতীতে মশ্গুল হয়ে স্বয়ং মহারাজা; তাঁর পরের হাতীটাতেই একমাত্র আমি, এবং আমার পরেও ডানহাতি, বাঁহাতি আরো গোটা কয়েক হাতী! তাতে অপাত্র-অমিত্ররা! হাতীতে হাতীতে যাকে বলে ধূল পরিমাণ! এতো ধূলো উড়লো যে দৃষ্টি অন্ধ, পথঘাট অন্ধকার—তার পরিমাণ করা যায় না।

জঙ্গল ভেঙে চলেছি। বাঁধা রাস্তা পেরিয়ে এসেছি অনেকক্ষণ, —এখন আর মশ্মশ্ নয়, মড়মড় করে চলেছি। এই 'মর্মর-ধ্বনি কেন জাগিল রে!'—ভেবে না পেয়ে হত-চকিত শেয়াল, খরগোস, কাঠবেড়ালির দল এধারে ওধারে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিয়েছে, শাখায় শাখায় পাখীদের কিচির মিচির, আর আমরা কারো পরোয়া না করে' চলেছি। হাতীরা কারো খাতির করে না।

চলেছি তো কতক্ষণ ধরে'। কিন্তু কোনো বাঘের ধড় দূরে থাক্, একটা ল্যাজও চোখে পড়ে না। হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর

কিসের সোরগোল শোনা গেল। কোথ্থেকে একদল বুনো জংলী লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল। তারা বনের মধ্যে ঢুকে কী করছিল কে জানে! মহারাজা হয়তো বাঘের বিরুদ্ধে তাদের গুপ্তচর লাগিয়ে থাকবেন। তারা বাঘের খবর নিয়ে এসেছে মনে হতেই আমার গায়ে ঘাম দেখা দিল।

কিন্তু তারা বাঘের বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য না করে হাত্তী হাত্তী বলে' চেঁচাতে লাগল।

হাত্তী তো কি? হাতী যে তা তো দেখ্তেই পাচ্ছো—হাতী কি কখনো দেখনি নাকি? ও নিয়ে অমন হৈচৈ করবার কী আছে? হাতীর কানের কাছে ওই চেঁচামেচি আর চোখের সামনে ওরকম লম্ফঝম্প আমার ভালো লাগে না। হাতীরা বন্য ব্যবহারে চটে গিয়ে ক্ষেপে যায় যদি? হাতীরও তো মানমর্যাদা আত্মসম্মানবোধ থাকতে পারে!

মহারাজাকে কথাটা আমি বল্লাম। তিনি জানালেন যে আমাদের হাতীর বিষয়ে ওরা উল্লেখ করছে না, একপাল বুনো হাতী এদিকেই তাড়া করে আস্ছে, সেই কথাই ওরা তারস্বরে জানাচ্ছে। এবং কথাটা খুব ভয়ের কথা। তারা এসে পড়লে আর রক্ষে থাক্বে না। হাতী এবং হাওদা সমেত সবাইকে আমাদের দলে পিষে মাড়িয়ে একেবারে ময়দা বানিয়ে দেবে।

তৎক্ষণাৎ হাতীদের মুখ ঘুরিয়ে নেয়া হোলো। কথায় বলে হস্তীযূথ, কিন্তু তাদের ঘোরানো-ফেরানোর এত বেজুত যে বলা যায় না। যাই হোক্, কোনো রকমে তো হাতীর পাল ঘুরলো, তারপরে এল পালাবার পালা।

আমার পাশ দিয়ে হাতী চালিয়ে যাবার সময় মহারাজা বলে গেলেন—"খবরদার! হাতীর থেকে একচুল যেন নোড়ো না। যত বড় বিপদ্‌ই আসুক, হাতীর পিঠে লেপ্‌টে থাকবে। দরকার হলে, দাঁতে কাম্‌ড়ে, বুঝেচো?"

বুঝতে বিলম্ব হয় না। দূরাগত বুনোদের বজ্রনাদী বৃংহণধ্বনি শোনা যাচ্ছিল—সেই ধ্বনি হন্‌ হন্‌ করতে করতে এগিয়ে আস্‌ছে। আরো—আরো কাছে, আরো আরো কাছিয়ে। ডালে ডালে বাঁদররা কিচমিচিয়ে উঠেছে। আমার সারা দেহ কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। ঘেমে নেয়ে গেলাম।

এদিকে আমাদের দলের আর আর হাতীরা বেশ এগিয়ে গেছে। আমার হাতীটা কিন্তু চল্‌তে পারে না। পদে পদে তার যেন কিসের বাধা! মহারাজার হাতী এত দূর এগিয়ে গেছে যে তার লেজ পর্যন্ত দেখা যায় না। আর সব হাতীরাও যেন ছুট্‌তে লেগেছে। কিন্তু আমার হাতীটার হোলো কী! সে যেন নিজের বিপুল বপুকে টেনে নিয়ে কোনোরকমে চলেছে।

আমাদের দলের অগ্রণী হাতীরা অদৃশ্য হয়ে গেল। আর এধারে বুনো হাতীর পাল পেল্লায় ডাক ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে আস্‌ছে—ক্রমশই তার আওয়াজ জোরালো হতে থাকে। আমার মাহুতটাও হয়েচে বাচ্চা। কিন্তু বাচ্চা হলেও সে-ই তখন আমাদের একমাত্র ভরসা।

জিজ্ঞেস করলাম—"কী হে! তোমার হাতী চল্‌চে না কেন? জোর্‌সে চালাও। দেখচ কী?"

"জোরে আর কী চালাবো হুজুর ? তিন পায়ে হাতী আর কত জোরে চল্‌বে বলুন ?" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বল্লে।

"তিন পা ! তিন পা কেন ? হাতীদের তো চার পা হয়ে থাকে বলেই জানি। অবশ্যি, এখন পিঠে বসে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু চার পা দেখেই উঠেছিলাম বলে' যেন মনে হচ্ছে। অবশ্যি, ভালো করে ঠিক খেয়াল করি নি।"

"এর একটা পা কাঠের যে ! পেছনের পা-টা। খানায় পরে পা ভেঙে গেছল। রাজাসাহেব হাতীটাকে মারতে রাজী হলেন না, সাহেব ডাক্তার এসে পা কেটে বাদ দিয়ে কাঠের পা জুড়ে দিয়ে গেল। এমন রঙ বার্নিশ যে ধরবার কিছু জো নেই। ইস্‌ট্রাপ দিয়ে বাঁধা কিনা !"

শুনে মুগ্ধ হলাম। ডাক্তার সাহেব কেবল হাতীর পা-ই নয়, আমার গলাও সেই সঙ্গে কেটে রেখে গেছেন। আবার মহারাজেরও এমন মহিমা, কেবল বেছে বেছে খোঁড়া হাতীই নয়, দুগ্ধপোষ্য একটা খুদে মাহুতের হাতে অসহায় আমায় সমর্পণ করে সরে পড়লেন !

"কাঠের হাতী নিয়ে বাচ্চা ছেলে তুমি কী করে চালাবে ?" আমি অবাক হয়ে যাই।

"বার্লি আমার নাম," সে সগর্বে জানাল,—"আর আমি হাতী চালাতে জানব না ?"

"বার্লি ? ভারী অদ্ভুত নাম তো !—" আমার বিস্ময় লাগে।

"আমি সাবুর ভাই। সাবু আমেরিকায় গেছে ছবি তুল্‌তে।"

"তোমার বার্লিনে যাওয়া উচিত ছিল।" না বলে আমি পারলাম না।—"গেলে ভালো করতে।"

শোন্‌বামাত্রই নিজের ভুল শোধরাতেই কিনা কে জানে, তৎক্ষণাৎ সে হাতীর ঘাড় থেকে নেমে পড়ল। নেমেই বার্লিনের উদ্দেশেই কিনা কে বল্‌বে, দে ছুট! দেখতে দেখতে আর তার দেখা নেই। জঙ্গলের আড়ালে হাওয়া।

আমি আর আমার হাতী, কেবল এই দুটি প্রাণী পেছনে পড়ে রইলাম। আর পেছন থেকে তেড়ে আস্‌ছে পাগলা হাতীর পাল! তেপায়া হাতীর পিঠে নিরুপায় এক হস্তিমূর্খ।

কিন্তু ভাববার সময় ছিল না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বাজ পড়ার মত আওয়াজ চার ধার থেকে আমাদের ছেয়ে ফেলল। গাছপালার মড়মড়ানির সঙ্গে চোখ ধাঁধানো ধূলোর ঝড়! তার ঝাপ্‌টায় আমার দম আটকে গেল একেবারে।

মহারাজার উপদেশমত আমি এক চুল নড়ি নি, হাতীর পিঠে লেপ্‌টে সেঁটে রইলাম! হাতীর পাল যেমন প্রলয়নাচন নাচতে নাচতে এসেছিল, তেমনি হাঁক-ডাক ছাড়তে ছাড়তে নিজের ধান্দায় চলে গেল।

তারা উধাও হলে আমি হাতীর পিঠ থেকে নামলাম। নামলাম না বলে' খসে পড়লাম বলাই ঠিক। হাতে পায়ে যা খিল ধরেছিল! নীচে নেমে একটু হাত-পা খেলিয়ে নিচ্ছি, ও মা, আমার কয়েক গজ দূরে এ কী দৃশ্য! লম্বা চওড়া বেঁটে খাটো গোটা পাঁচেক বাঘ একেবারে কাৎ হয়ে শুয়ে! কর্তা, গিন্নী, কাচ্চা-বাচ্চা সমেত পূরো একটা ব্যাঘ্র-পরিবার! হাতীর তাড়নায়,

হয়ত বা তাদের পদাঘাতেই, কে জানে, হতচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে।

কাছাকাছি কোথাও জলাশয় থাকলে কাপড় ভিজিয়ে এনে ওদের চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে পারলে হয়তো বা জ্ঞান ফেরানো যায়! কিন্তু এই বিভূঁয়ে কোথায় জলের আড্ডা আমার জানা নেই। তাছাড়া, বাঘের চৈতন্য-সম্পাদন করা আমার অবশ্য-কর্তব্যের অন্তর্গত কিনা সে বিষয়েও আমার একটু সংশয় ছিল।

আমি করলাম কী, প্রবীণ বনস্পতিদের ঘাড় বেয়ে যেসব ঝুরি নেমেছিল তারই গোটা কতক টেনে ছিঁড়ে বাঘগুলোকে একে একে পিছমোড়া করে বাঁধলাম। হাত, পা, মুখ বেঁধে-ছেঁদে সবাইকে পুঁটলি বানিয়ে ফেলা হোলো—তখনো ব্যাটারা অজ্ঞান।

হাতীটা এতক্ষণ ধরে নিস্পৃহভাবে আমার কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল। এবার উৎসাহ পেয়ে এগিয়ে এসে তার লম্বা শুঁড় দিয়ে এক একটাকে তুলে ধরে নিজের পিঠের উপর চালান্ দিতে লাগল। সবাই উঠে গেলে পর সব শেষে ওর ল্যাজ ধরে আমিও উঠ্লাম। তখনো বাঘগুলো অচেতন। সেই অবস্থাতেই হাওদার সঙ্গে শক্ত করে' আর এক প্রস্থ ওদের বেঁধে ফেলা হোলো।

পাঁচ পাঁচটা আস্ত বাঘ—একটাও মরা নয়, সবাই জলজ্যান্ত। নাকে হাত দিয়ে দেখলাম নিশ্বাস পড়ছে বেশ। এতগুলো জ্যান্ত বাঘ একাধারে দেখলে কার না আনন্দ হয়? একদিনের এক চোটে এক সঙ্গে এতগুলো শিকার—এ কি কম্ কথা?

গজেন্দ্রগমনে তারপর তো আমরা রাজধানীতে ফিরলাম। বাচ্চা মাহুত বার্লি ব্যগ্র হয়ে আমাদের প্রতীক্ষা করছিল। এখন অতগুলো বাঘ আর বাঘান্তক আমাকে দেখে বারম্বার সে নিজের চোখ মুছতে লাগল। এরকম দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস সে করতে পারছিল না!

খবর পেয়ে মহারাজা ছুটে এলেন। বাঘদের হাওদা থেকে নামানো হোলো। ততক্ষণে তাদের জ্ঞান ফিরেছে, কিন্তু হাত-পা বাঁধা—নেহাৎ বাঁধা! নইলে, পারলে পরে, তারাও বার্লির মতো একবার চোখ মুছে ভালো করে' দেখবার চেষ্টা করত।

এতগুলো বাঘকে আমি একা স্বহস্তে শিকার করেছি এটা বিশ্বাস করা বাঘদের পক্ষেও যেমন কঠিন, মহারাজার পক্ষেও তেমনি কঠোর। কিন্তু চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে' দেখলে অবিশ্বাস করবার কিছু ছিল না।

কেবল বার্লি একবার ঘাড় নাড়বার চেষ্টা করেছিল—"এত-গুলো বাঘকে আপনি একলা—হাতিয়ার নেই, কিছু নেই...... বহুৎ তাজ্জব কী বাৎ.........!"

"আরে হাতিয়ার নেই, হাত ছিল তো?" বাধা দিয়ে বল্‌তে হোলো আমায়। "আর, তোমার হাতীর পা-ই তো ছিল হে! তাই কি কম হাতিয়ার? বাঘগুলোকে সাম্‌নে পাবা মাত্রই, বন্দুক নেই টন্দুক নেই করি কী, হাতীর কাঠের পা-খানাই খুলে নিলাম। খুলে নিয়ে দু'হাতে তাই দিয়েই এলোপাতারি বসাতে লাগলাম। ঘা কতক দিতেই সব ঠাণ্ডা! হাতীর পদাঘাত—কি কম ব্যাপার? অবশ্যি, তোমাদের হাতীকেও

ধন্যবাদ দিতে হয়। বল্‌বামাত্র পেছনের পা দান করতে সে পেছ-পা হয়নি। আমিও আবার কাজ সেরে তেম্‌নি করেই তার ইস্ট্র্যাপ্‌ লাগিয়ে দিয়েছি। ভাগ্যিস্‌, তুমি হাতীটার কেটো পা-র কথা আমায় বলেছিলে...!"

অম্লানবদনে এত কথা বলে' হাতীর দিকে চোখ তুলে চাইতে আমার লজ্জা করছিল। হাতীরা ভারী সত্যবাদী হয়ে থাকে। এবং হাতীদের মতো সাধুপুরুষ দেখা যায় না প্রায়। ওর পদচ্যুতি ঘটিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছি এই মিথ্যা কথায় কেবল বিরক্তি নয়, ও যেন রীতিমতো অপমান বোধ করছিল। এমন বিষ-নজরে তাকাচ্ছিল আমার দিকে যে—কী বল্‌ব! বলা বাহুল্য, তারপর আর আমি ওর ত্রিসীমানায় যাই নি।

হাতীরা সহজে ভোলে না।

আমসত্ত্ব-শিকার

"দাদা, দাদা! আমসত্ব!!" বিনি লাফাতে লাফাতে এলো। আমিও লাফিয়ে উঠ্‌লাম—"কোথায় রে?"

"গোকুলদা'র দোকানে।" জানালো বিনি। "আইভিদি কিনে এনেছে দেখলাম। এই মাত্তর।"

এখন, আমসত্ত্বের নামে আমার নাল পড়ে। আম আমি ততটা ভালবাসিনে, আম আমার সহ্য হয় না। আম নিজে ঠিক অসহ্য না হলেও, আম খেলে আমার সর্দি হয়, আর সর্দি হলেই হাঁচি আসে—দু' হাজার পাঁচ হাজার হাঁচি—ধারাবাহিক আসতে থাকে; সেটা এক অসহ্য ব্যাপার। যেমন আমার, তেমনি আশে পাশের আর সবাইকার। আশ্চর্য কি? আমার হাঁচির ধাক্কা আমি নিজেই সইতে পারি না—যারা পর, যারা আমার হাঁচির আপনার নয়, তারা কেন সইতে যাবে?

অতএব, আমসত্ত্বকে আমি ভালোবাসি। ও আমাকে হাঁচায় না। আমের মধ্যে যেটুকু সত্য, যেটুকু আমার প্রথমার্ধ, আর যা সুন্দর,—এক কথায়, সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্—আঁটি, আঁশ আর খোসা বাদে তাই যেন ঘন হয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে অপরূপ আমসত্ত্ব-রূপ নিয়েছে। অতি উপাদেয়—ঐ আমসত্ত্ব।

গোকুলদা'র দোকানে গিয়ে পড়লাম। গোকুল, গোকুলের বাবা, মা, আর ছোট বোন সবাই মিলে আড়ালে বসে কী যেন্ চাখছিল, আমি যেতেই লুকিয়ে ফেল্‌ল ফস্ করে'। লুকিয়ে মুখ মুছে গম্ভীর হয়ে গেল সক্কলে। সারা গোকুলপুরী আমার আগমনে অন্ধকার দেখা গেল।

"গোকুল, আমাকে একটু আমসত্ত্ব দেবে?" আমি বল্লাম।

"কোথায় পাবো আমসত্ত্ব? বলে, আমই চোখে দেখতে পাই না—" গোকুল আরো ভালো করে মুখটা মুছল। নিজের বোনের মুখটা।

"দেখবে কী করে'? আমসত্ত্ব হয়ে গেলে তার পরে আমকে কি আর দেখা যায়? আমের আমত্ব লোপ পেয়েই তো আমসত্ত্ব হয়। যেমন তুধ মরে গিয়ে—তুধ মরে গিয়ে—"

দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে আমি মুস্কিলে পড়ি। তুধ মরে গিয়ে কী যে হয় কিছুতেই আমার মনে পড়ে না। মানুষ মরে ভূত হয় জানি, মুরগি মারা পড়লে কাট্‌লেট্‌ হয়ে থাকে তাও জানা আছে, কিন্তু তুধ মরে গিয়ে—যাচ্চলে!

কিন্তু তুধকে তো বেশিক্ষণ মৃত্যুমুখে ফেলে রাখা যায় না। কিছু একটা বিহিত করতে হয়। অগত্যা...

"—তুধ মরে গিয়ে যেমন রসগোল্লা, পান্তুয়া, জিবেগজা, জিলিপি আর ছানার পায়েস হয় তেমনি—"

"তুধ মরে গিয়ে জিলিপি হয় না।" গোকুলের মা তীব্র প্রতিবাদ করেন।

"জিবেগজাও না।" গোকুলের বোন আমাকে শোনায়।

"আইস্‌ক্রিম্‌ও হয় না, আমি আশা করি।" গোকুলের অকূল নৈরাশ্যবাদ।

কিন্তু আমি কি তেম্‌নি ছেলে যে বাধা পেলেই 'তেমনি'তে গিয়ে ঠেকে থাকব? আমিও বলে' নিই—

"তেমনি আমের আশা পূর্ণ হলে, নিতান্ত যদি আমাশা হয়ে না দাঁড়ায়, যদি সেই আম কোনোগতিকে অন্তের পাকস্থলীর

বাইরে নিজেকে নিজগুণে হজম করতে পারে তা হলে অনিবার্য রূপেই তা আমসত্ত্ব হয়ে ওঠে। আমের সেই আপনাকে আত্মসাৎই হচ্চে আমসত্ত্ব।"

গোকুলের বাবা এতক্ষণ কিছু বলেন নি। দুধ মরে ছানার পায়েস হওয়ার বিষয়ে ওঁধার থেকেই হয়তো একটু আপত্তি আসবে আমি আশা করেছিলাম, কিন্তু তিনি নীরবে মুখ টিপে—কী যেন চিবুচ্চিলেন; এবার কোঁৎ করে গিলে ফেলে একটি কথা বল্লেন—"তোমার মুণ্ডু।" সাধারণতঃ বেশি কথা তিনি বলেন না।

"দাও আমাকে সেই আমসত্ত্ব।" আমিই বলি অবশেষে।

"কোথায় পাবো? আমসত্ত্ব আমি কখনো চোখেই দেখিনি, দেব কোথ্থেকে?"—গোকুল বলতে থাকে।

"কী করে দেখবে? ও তো চোখে দেখার বস্তু নয়, চেখে দেখার জিনিষ। এতক্ষণ ধরে তোমরা তো চেখে চেখে দেখেছো —এবার আমিও একটু দেখতে চাই।"

"স্বচ্ছন্দে। আমার দোকান তো পড়েই আছে, নিজেই খুঁজে পেতে ছ্যাখো, যদি দেখতে পাও। আমরা কি মিথ্যে বলছি—?" গোকুল এবার একগাদা লবঙ্গ নিজের মুখে ফেলে দিল। আমি কি ওর মুখের মধ্যে গিয়ে আমসত্ত্বর খবর নেব ভেবেছিলো নাকি?

আমি আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে লাগলাম। আর তেমন তেমন করে' খুঁজলে কী না মেলে? ছাইয়ের ভেতরে লুকোনো রতন থেকে আরম্ভ করে বড় বড় চোর, ডাকাত, খুনের আসামী—এমন কি ভগবান অবধি অনেক রত্নেরই দর্শন পাওয়া যায়। একটু খুঁজ্তেই আমসত্ত্বর চাপড়াটা আমার হাতে

এসে ঠেক্‌ল, যেমন করে মানুষ হাতে স্বর্গ পায়—অবিকল সেইরকম।

"আচ্ছা, এখন আমি চল্লাম। দামের কথা পরে বিবেচ্য।" চাপড়াটা আঁক্‌ড়ে নিয়ে আমি দোকানের দিকে পিঠ ফেরাই। "যা হয় দেয়া যাবে'খন পরে।"

গোকুল হাঁ হাঁ ক'রে হাঁকড়ে আসে—"ও কি! কী হচ্ছে? পালাচ্ছো যে বড়? বলছি না যে আমার আমসত্ত্ব নেই? আর থাকলেও আমি তা বেচব না?" গোকুল গাল ফুলিয়ে চ্যাঁচাতে থাকে। এবং ওর তিন কুল—বাবা মা আর বোন—ব্যাকুল হয়ে হাঁস্‌ ফাঁস্‌ করে, কী করবে ভেবে পায় না।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে গোকুলের চেহারা বদ্‌লে গেল। তার মারমূর্তি দেখলাম। কপালের দু' পাশের রগ্‌ ফুলে উঠেছে—চোখ টক্‌টকে লাল। তার দু' হাতের মাশুল—দ্বিগুণ বেড়ে গেছে—ডাকের মাশুল বেয়ারিং হলে যেমন বেড়ে যায়। জামার হাতা গুটিয়ে, বুক ফুলিয়ে আমার সম্মুখে সে এগিয়ে এল। খুন করবার সময়ে মানুষের চেহারা নাকি এই রকম বদ্‌লে যায় বলে' শুনেছি।

আমি তো চোখের সাম্‌নে গোকুলের স্থলে সর্ষে ফুল দেখতে লাগলাম। কিন্তু দেখলে কী হবে, এত কষ্টের আমসত্ত্বকে তো ফেলে দিয়ে পালিয়ে আসা যায় না! আমি ওকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করি।

"দ্যাখো গোকুল, এই জন্যেই আমাদের বাঙালীর কখনো উন্নতি হয় না। সামান্য একটু আমসত্ত্বের জন্য তুমি কিরূপ আচরণ

করছ—ভেবে ছাখো একবার। তাহলে তুমি নিজেই লজ্জিত হবে। বঙ্কিমচন্দ্র বলে গেছেন, 'বাঙালীকে বাঙালী না দেখিলে কে দেখিবে?' অথচ তুমি আমাকে মোটেই দেখচ না—তার বদলে তুমি তোমার আমসত্ত্বকেই শুধু দেখছ। 'কিন্তু আমসত্ত্ব কি তোমার বাঙালী? আর বিবেকানন্দ বলেছেন—'চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না।' তিনি আরো বলেছেন, 'জীবে দয়া করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' ভেবে ছাখো, আমসত্ত্ব কিছু চালাকি নয়—এবং তার দ্বারা একটি জীবের প্রতি দয়া করা যায়—দৃষ্টান্তস্বরূপ, যথা—" আমি নিজের জিব বার করে' দেখাই: "আর এই জিবটি নেহাৎ ফ্যাল্‌না না। এর প্রতি পরোপকার করতে হলে একমাত্র আমসত্ত্বের দ্বারাই সেই সুযোগ তুমি পেতে পারো। তুমি যদি চালাকি না করে আমসত্ত্বটা দিয়ে দাও তাহলে সত্যই জিবে দয়া করা হবে—এবং আমার জিবের প্রতি দয়া করে তোমার ঈশ্বরের সেবা হয়ে যাবে। জিবের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন বলে গেছেন বিবেকানন্দ। উপনিষদেও বলেছে—রসো বৈ সঃ। রসনায় তাঁর বাস। আজ কত শত—কতো না আমাদের ভারতবাসী না খেতে পেয়ে অকাতরে প্রাণ দিচ্ছে—আর—আর তুমি সামান্য এই আমসত্ত্বটুকু ছাড়তে পারছ না? ছিঃ, গোকুল, ছিঃ! তুমি সভ্য সমাজের কলঙ্ক। এ কাণ্ড তোমার যোগ্য নয়। তোমার উপযুক্ত কাজ না। তুমি আর্যসন্তান, এরূপ ব্যবহার তোমার কাছে আশা করিনি—" এর পরে আমি মেদিনীপুরের ঝড়, পঞ্চাশের মন্বন্তর, মহামারী, আগস্টের আন্দোলন, সেদিনের সাইরেন-ধ্বনি—সমস্ত একে একে এনে ফেল্লাম

—এবং তখনো আমার হাতে প্রফুল্লচন্দ্রের চাঁছা ছোলা কথা আর রবীন্দ্রনাথের 'হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙ্গালিনী মেয়ে' সম্পুর্ণ মজুদ্। সেই সঙ্গে 'নাগিনীরা দিকে দিকে' তৈরি রয়েছে, তাদের 'বিষাক্ত নিশ্বাস' ছাড়ি নি তখনো। কিন্তু আর দরকার হোলো না ছাড়বার—তার আগেই জিতে গেলাম। যখন আমি ঝড়ের মত বয়ে চলেছি—বলে চলেছি—কবিগুরুর ভাষায়ঃ

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য মাঝারে কবি,
একবার স্বর্গ হতে নিয়ে এসো বিশ্বাসের ছবি।
একথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর সাজাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায়
জীবন যৌবন ধনমান।
যায় যাক্, শুধু থাক্—
এক বিন্দু নয়নের জল।
যাহারা তোমার—যাহারা তোমার—বিষায়িছে তব বায়ু।
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছো—তুমি কি বেসেছো ভালো...?"

গোকুলের বাবা আর্তনাদ করে উঠ্লেন—"দোহাই বাবা, রক্ষে করো! ভগবানের দোহাই! বাবা গোকুল, হতভাগাটাকে আমসত্ত্বটা দিয়ে বিদেয় করে দাও। মেরে তাড়াও—এমনি যদি না যায়। আর তো সহ্য হয় না বাবা।"

কিন্তু আমাকে মেরে তাড়াতে হোলো না—আমসত্ত্বের তাড়াতেই আমি চলে এলাম।

টিপ্পনী

"আশ্চর্য !• কোথাও একটা কাজকর্ম যোগাড় করে' নিতে পারছো না ?" বাবা খুব চটে মটে ছেলের ওপর তম্বি লাগালেন ঃ "তোমার বয়সে আমি যেকোনো কাজ করতে দ্বিধা করিনি। সামান্য পনের টাকা বেতনে একটা দোকানে ঢুকেছিলাম— তারপরে পাঁচ বছরের মধ্যে আমিই সেই দোকানের মালিক হয়ে গেলাম। স্রেফ নিজের চেষ্টায়।"

"একালে আর তা হয় না, বাবা। খাতাপত্র অডিট করা হয় আজকাল। তাছাড়া, কর্তাদের ভারী কড়া নজর।"

... ...

বাড়ীওয়ালা তার ভাড়াটেকে লিখেছে ঃ

"খুব দুঃখের সঙ্গে, আমার ভাড়া বাকী পড়বার কথাটা আপনাকে জানাচ্ছি। টাকাটা কি দয়া করে' পাঠাবেন আজকে ?"

ভাড়াটের কাছ থেকে জবাব গেল ঃ

"মশাই, আপনার ভাড়া আমি যে কেন দিতে যাবো তার কোনো মানে পেলাম না। আমার নিজের ভাড়াই আমি দিতে পারছিনে।"

প্রানকেষ্টর আরেক কাণ্ড!

প্রাণকেষ্টর বিশ্বাস, তার শিক্ষার বয়স এখনো পেরোয় নি। এখনো চেষ্টা করলে অনেক কিছু সে শিখতে পারে। কিন্তু কী শিখবে ?

অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলো মোটর চালানো শিখবে সে। পর্‌তা গাড়ীর দৌলতে আগের একটু হাতে খড়ি হয়ে আছে—সেইটে ঝালিয়ে পাকাপাকি রকমে শিখলে নেহাৎ মন্দ হয় না।

এক মোটর-শিক্ষালয়ের ঠিকানা প্রাণকেষ্টর জানা ছিল। সখের খাতিরে বা পেশার দায়ে কেউ মোটর চালানো শিখতে চাইলে সেখানে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তার সুব্যবস্থা আছে, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন-পাঠে একথা সে জেনেছিল। সেইখানেই গেল সে।

শিক্ষালয়টা একটা মেরামতি কারখানা মাত্র, প্রাণকেষ্ট দেখল। খান্‌কয়েক মোটরগাড়ী নিয়ে মিস্ত্রি-মজুর জনকয়েক উঠে পড়ে লেগেছে। আস্ত মোটরকে ভাঙছে, আর ভাঙা মোটরকে জুড়ছে। একখানাকে তিনখানা আর তিনখানাকে একখানা—এই করাই তাদের কাজ বলে তার মনে হোলো। মোটরদের তারা দস্তুরমত শিক্ষা দিচ্ছে—হয়ত বা বলা গেলেও, তাদের কাউকে বিজ্ঞাপনবর্ণিত উক্ত উপযুক্ত শিক্ষক বলে তার বোধ হোলো না।

কারখানার একদিকে আপিসঘরের মত একটুখানি ছিল। টেবিল চেয়ার জমানো জায়গাটা। প্রাণকেষ্ট সেইখানে গিয়ে খোঁজ নিল।

আরেকটি যুবক ছিল সেখানে—বেশ সভ্যভব্য স্মার্ট। তাকে শিক্ষক বলে সন্দেহ করে এগিয়ে গেল প্রাণকেষ্ট।

—আজ্ঞে, কিছু মনে করবেন না। আপনিই কি মোটর-শিক্ষক? জিজ্ঞেস করল ও।

—আজ্ঞে না। আমি শিখতে এসেছি।

এই সময়ে বৃহদাকার এক ভদ্রলোক সেখানে ঢুকলেন—দিব্যি অমায়িক চেহারার।—কে এখানে মোটরশিক্ষকের কথা বল্‌ছিল না? শুনলাম যেন! শুধালেন সেই আগন্তুক।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমিই। প্রাণকেষ্ট জবাব দিল।

—আমার ড্রাইভারটা প্রায়ই কামাই করে। মাঝে মাঝে কোথায় যে পালিয়ে যায় জানি না। দেখছি নিজে না চালাতে শিখলে আর চলে না। যুবকটি জানালো।

—ও, তুমি একজন শিক্ষার্থী তাহলে? ভদ্রলোক বল্লেন।

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

এইবার সেই বিপুল-বপু লোকটি প্রাণকেষ্টর দিকে ফিরলেন। —এই শিক্ষার্থীটি ততক্ষণ বসুন, ইতিমধ্যে আমরা একটু মোটরে করে বেড়িয়ে এলে কেমন হয়? জিজ্ঞেস করলেন তিনি প্রাণকেষ্টকে।

এই অতিকায় ভদ্রলোক, ডাঃ প্রতুলচন্দ্রের অতিশয় ভদ্রতার কথা সে অঞ্চলে কারো অবিদিত ছিল না। তাঁর অমায়িকতায় রুগীরা যেমন মুগ্ধ ছিল, তাঁর বৌ তেমনিই তিত-বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। আর কিছু না, তাঁর এই ভাব-বাচ্যের কথাবার্তাই তার কারণ।

রুগী এবং স্বীয় পত্নীর প্রতি (তিনি রুগী না হলেও) তিনি অভিন্ন ব্যবহার করতেন।

সকালে উঠেই প্রথম কথা তাঁর ছিল—একবার জিভটা তো দেখতে হয়।

বৌ জিভ বার করতে একটু দেরি করলে তাঁর বাক্যের দ্বিতীয় ভাগ শোনা গেছে—জিভটা আমাদের একবার দেখা দরকার। লজ্জা কী দেখাতে ?

তারপর জিভ-টিভ দেখে, নাড়ি-টাড়ি টিপে হয়ত বলছেন—আজকে আমরা বেশ ভালোই আছি মনে হচ্ছে। তবু একটু সিরপ্ অফ্ ফিগ্স্ খেয়ে রাখা ভালো। দু'চামচ মাত্রায় সম পরিমাণ জলের সঙ্গে খাবো আমরা—কেমন ? পেট পরিষ্কার থাকলে কখনো আমাদের কোনো অসুখ করবে না। (বলা দরকার এই সিরপ্ তিনি স্বয়ং কখনো খেতেন না।)

পত্নীর অরুচি ধরলেও, রুগীরা ডাক্তারের এই আত্মীয়তা পছন্দই করতো। পাছে এহেন পরমাত্মীয় চিকিৎসককে দূরে রাখতে হয় এই ভয়ে, শোনা যায়, তারা আপেল নাকি ছুঁত না পর্যন্ত। (আপেল ফলের ডাক্তার-তাড়ানো অসামান্য খ্যাতির কথা তাদের অজানা ছিল না।)

রুগী অন্তিম দশায় পৌঁছনোর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর এই আত্মীয়-ভাব অটুট থাকতে দেখা যেত। কেবল সেই চরমক্ষণে, রুগীর আসন্ন তিরোভাবের আগেই তিনি ভাববাচ্য এবং উত্তম পুরুষের বহুবচন পরিত্যাগ করে অধম পুরুষের একবচনে নেমে আসতেন। 'আমরা ভালো হয়ে উঠব, ভয় কী?' যে-তিনি

এই কথাই আগের ভিজিটে বলে গেছেন, সেই তিনিই, কেন বলা যায় না, 'আমাদের আর বাঁচানো গেল না' একথা না বলে 'ওকে আর বাঁচাতে পারলুম না। অক্কাই পেল মনে হচ্ছে!' এই কথাই বলে ফেলেছেন।

যুবকের কথা শুনে প্রতুলচন্দ্রের মনে হোলো তাঁর সোফারেরও তো প্রায় সেই ব্যারাম। পালিয়ে-যাওয়া-ব্যারাম ঠিক না হলেও, ব্যারাম হলেই সে পালিয়ে যায়। হয়ত ডাক্তারি চিকিৎসার ভয় ততটা তার নয় যতটা বুঝি বা ডাক্তারি আত্মীয়তার—আর সে যখন বাড়ীর বৌ নয়, তখন তার পালাতে বাধা কী?

এই যেমন আজকে আর তার টিকি দেখা যাচ্ছে না। প্রতুলচন্দ্র মনে করলেন, ঐ যুবকের অনুকরণীয় আদর্শ অনুসরণ করে তাঁর নিজেরও মোটর-চালনাটা রপ্ত করে রাখলে মন্দ হয় না। এবং শিক্ষককেও যখন এত সহজে, আসামাত্রই, হাতের নাগালে পাওয়া গেছে তখন এ-সুযোগ ছাড়া কেন?

—একটু মোটর চালানো তাহলে শেখা যাক্। কেমন? প্রাণকেষ্টকে তিনি বলেছেন।—সাঁতারের মতন, মোটর চালানোটা আমাদের প্রত্যেকেরই শিখে রাখা দরকার—কখন কী কাজে লাগে! তাই না কী?

—সে কথা ঠিক। বলেছে প্রাণকেষ্ট।

ডাঃ প্রতুলচন্দ্র এবং তাঁর ভাববাচ্যের সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় না থাকায় তাকেই সে মোটর-শিক্ষক বলে' ভ্রম করেছে বলাই বাহুল্য। কিন্তু ডাক্তার যে তাকেই শিক্ষক বলে' ঠাউরেছেন, এ-তথ্য সে ধরতে পারে নি। তাদের কাছাকাছি প্রকাণ্ড এক

সালুন গাড়ী তখনো অটুট অবস্থায় ছিল—তখন অবধি মিস্ত্রি-মজুররা কেউ তার পেছনে লাগে নি।

—এইখানাই বার করা যাক্—কেমন? ডাঃ প্রতুলচন্দ্র প্রস্তাব করেছেন।—ক্ষতি কী?

গাড়ীর ভেতর কে কোন্ স্থান অধিকার করবে, তাই নিয়ে দু'জনেই একটুক্ষণ ইতস্ততঃ করেছেন। প্রাণকেষ্ট জিজ্ঞেস করেছে—আপনি তাহলে চালকের আসনে বসুন।

—না না। আমি কেন? জবাব দিয়েছেন প্রতুলচন্দ্র—কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়েই, বলতে কী!

—আমিই চালাবো তাহলে? প্রাণকেষ্ট বলেছে: বেশ। আপনি আমার পাশেই থাকচেন তো?

—তা, পাশাপাশি বসতে আপত্তি কী আমাদের? প্রতুলচন্দ্রের তাড়া দেখা গেছে এবার—চট্ করে' বেরিয়ে পড়া যাক তাহলে। বাজে সময় নষ্ট করে কী লাভ?

—কোন্ দিকে যাবো? ড্রাইভারের আসনে বসে প্রশ্ন করেছে প্রাণকেষ্ট।

—রাস্তায় তো পড়া যাক্ আগে। তারপর হাওড়া ব্রিজ হয়ে—

—য়্যাঁ? একেবারে হাওড়া পর্যন্ত?

—নিশ্চয়। বলেছেন প্রতুলচন্দ্র: এমন কি, তারও ওধারে—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে' যদ্দূর যাওয়া যায়। চালাতে শেখার সাথে সাথে যদি একটু হাওয়া খাওয়া যায় মন্দ কী?

পা দিয়ে গাড়ীতে স্টার্ট দিতেই ইঞ্জিনের পত্রপাঠ প্রত্যুত্তর

পেয়ে প্রাণকেষ্ট চমৎকৃত—এ রকম গাড়ী এর আগে সে পা-য় নি। হাতায়নিও এর আগে।

ছুটে বোঁ করে বেড়িয়ে গেছে গাড়ীটা। এত বড় গাড়ী, যার বনেট্‌টাই এতখানি, করায়ত্ত করা প্রাণকেষ্টর এই প্রথম। কিন্তু তাহলেও একজন ওস্তাদ্‌ শিখিয়ের পাশে বসে' চালানোয় তার আর ভয় কী?

—বাঃ, দিব্যি ফাঁকা রাস্তা! আরো একটু জোরে চালানো যায় না?

—কতো জোরে চালাতে আপনি বল্‌ছেন?

—যত জোরে চালানো যেতে পারে।

অদ্ভুত গাড়ী! য্যাক্‌সিলারেটরে পা ছোঁয়াতেই না তীরবেগে উধাও! একটা ঘোড়ার ল্যাজ ঘেঁষে চলে গেছে উল্কার মত।

—চমৎকার! চমৎকার চালানো! এক চুলের জন্মই বেঁচে গেছে ঘোড়াটা। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন ডাক্তার।

এই কৃতিত্ব সত্যিই ওর চালনা-নৈপুণ্য কিনা, প্রাণকেষ্ট ভেবেছে। ভেবে একটু অবাক হয়েছে, বল্‌তে কী!

—আবার কি ঐ রকম একটা কিছু করা যায় না?

—তা—চেষ্টা করলে—হয়তো—

—আমাদের সাম্‌নে ঐ—ঐ যে রেসিং কার চলেছে দেখা যাচ্ছে—ফিরিঙ্গি ছেলেমেয়েরা চেপে স্ফূর্তি করে চলেছে—ওর একেবারে ধার্‌ ঘেঁষে—প্রায় দাড়ি কামানো গোছ চেঁছে দিয়ে যাওয়া যায় না? পাশ দিয়ে যাবার সময় খুব জোর্‌সে হর্ণ বাজিয়ে যেতে হবে কিন্তু।

প্রাণকেষ্ট সন্ত্রস্ত চোখে সঙ্গীর দিকে তাকালো। রীতিমতো সঙ্গীন্ পরীক্ষাই এ যে!

কিন্তু নাচতে নেমে ঘোম্‌টা রাখা যায় না। শিক্ষালাভ করতে এসে পরীক্ষার কালে প্রশ্নপত্রকে ফাঁকি দেয়া চলে না।

রেসিং-কারের দাড়ি চেঁছে যাবার সময় তার মনে হোলো, গাড়িটা যেন শিস দিয়ে চলেছে সেই সঙ্গে হর্ণের এমন কান ফাটানো আওয়াজ! আর সঙ্গে সঙ্গে ও-গাড়ীর হল্লাকারীদের কী বিচ্ছিরি আর্তনাদ! বাতাসে চীৎকারটা গপ্ করে গিলে ফেল্ল তাই রক্ষে, নইলে প্রাণকেষ্টর কান যায়-যায় হয়েছিল।

—তোফা! উল্লসিত হয়ে উঠলেন ডাক্তার। —আচ্ছা, কতো তাড়াতাড়ি তুমি মোড় ঘোরাতে পারো? স্পীড একদম্ না কমিয়ে মোড় নিতে পারো না?—অস্বাভাবিক উৎসাহে এমন কি তিনি স্বাভাবিক ভাববাচ্য অবধি ভুলে গেলেন। প্রাণকেষ্টর মৃত্যু আসন্ন জেনেই কিনা কে জানে!

—বল্‌তে পারব না ঠিক—জবাব দিল প্রাণকেষ্ট।—কখনো চেষ্টা করি নি।

—আচ্ছা, সামনের বাঁকটায় ঘোরো তো দেখি? যতো তাড়াতাড়ি পারা যায়।

প্রাণকেষ্টর হাত কাঁপতে থাকে ষ্টিয়ারিং হুইলের ওপর। শিক্ষালাভ করতে হলে প্রাণপণ করতে হয়, এমন কি, প্রাণ দিয়ে শিক্ষা পাওয়াটাই আসল শিক্ষা—প্রাণকেষ্টর তা অজানা নয়। ‘রক্ত দিয়ে কী লিখিব—প্রাণ দিয়ে কী শিখিব—কী করিব কাজ?’ রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই কলিও তার মনে পড়ে। কিন্তু তবুও তার প্রাণ কাঁপে, হাত কাঁপতে থাকে।

—তবে তাই হোক্। তথাস্তু। মনে মনে নিজেকে এই কথা বলে প্রাণকেষ্ট মরিয়া হয়ে পড়ে। মোড়ের মুখের পথিকরা, গ্রহের চক্রান্তে সেই দণ্ডে যারা মরবার মুখেই ছিল, চীৎকার ক'রে ওঠে; গাড়ীটাও এক ধারের দুটো চাকা স্বর্গের দিকে তুলে দেয়। কিন্তু তক্ষুনি আত্মসম্বরণ করে ভূমিষ্ঠ হয়ে নিজেকে সোজা করে নিতে সে দেরি করে না।

এবার গাড়ীটা মোড়ের পাহারোলার ল্যাজ ঘেঁষে গেছল। ধনুষ্টঙ্কারের মত বেঁকে নিজেকে সে সোজা করে নিয়েছে।

অদ্ভুত অদ্ভুত!—উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ডাক্তার।—বিলেতে যেসব মোটরের রেস হয়, তাতে তোমার যোগ দেয়া উচিত।

—আপনি—আপনি কি সত্যিই বল্‌ছেন? আমি—আমি কিন্তু কখনো সেকথা ভাবিনি। প্রাণকেষ্ট নিজেকে অভাবিত জ্ঞান করে।

আচ্ছা, এই যে সব গাড়ীঘোড়া যাচ্ছে, এদের ভেতর দিয়ে এদের ডাইনে বাঁয়ে রেখে এঁকে বেঁকে—যেমন করে ফুটবল কেয়ারি করে নিয়ে যায়, তেম্‌নি করে যেতে পারো না তুমি?

—আপনি কি মনে করেন? পারব কি?

—তুমি সব পারো। ডাক্তার হাসতে থাকেন।—আমার মনে হয়, তোমার অসাধ্য কিছু নেই!

অকস্মাৎ প্রাণকেষ্টরও মনে হয়, সে সব পারে। এতক্ষণ তাদের গাড়ী বড় রাস্তা ধরে ছুটছিল বটে, কিন্তু এবার আরো চওড়া রাস্তায় চড়াও হোলো। চারিধারে গাড়ী, ঘোড়া, মোটর লরীর ছড়াছড়ি; ট্রাম যাচ্ছিল, আসছিল। প্রতুল ডাক্তার

প্রাণকেষ্টর কানে কানে কী যেন বল্লেন। কানাকানি করবার মতই কথা বটে! মুহূর্তের জন্য প্রাণকেষ্ট ভয়ে জমে যেন জড় পদার্থ হয়ে গেল। তারপর বল্ল, কোন্ ধার দিয়ে যাবো? যে ট্রাম যাচ্ছে তার ডান ধার দিয়ে, না কি, যে-ট্রাম আসছে তার—

তা কেন? যা বল্লাম! দু'টো ট্রামের মধ্যিখান দিয়ে—তারা পাশাপাশি এসে পড়বার ঠিক আগের মুহূর্তে কেটে বেরিয়ে যাও।

প্রাণকেষ্ট ঠিক অক্ষরে অক্ষরে বুঝতে পারে না।—কি রকম?

—আহা! এ-ট্রামটা যাবে আর ও-ট্রামটা আসবে—তারা মুখোমুখি এসে পড়বার মুখে তাদের মাঝখান দিয়ে বন্দুকের গুলির মত বোঁ করে গাড়ীটাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। সিকি সেকেণ্ডের এদিক ওদিক হলে দুটো ট্রামের মাঝখানে পড়ে পিষে চ্যাপটা চকোলেট হয়ে যাবো আমরা। এবার বুঝেচ?

প্রাণকেষ্ট ঢোঁক গিল্‌ল। চরম পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে বুক বাঁধল সে। আশে-পাশের ট্রামের ঘর্ঘর-ধ্বনি যেন রেলগাড়ীর শব্দের মত কানে বাজতে থাকে। চোখের সামনে সমস্ত আবছা বলে ধারণা হয়। ওস্তাদজী যদি অন্ততঃ তাঁর একটা হাতও ষ্টিয়ারিং হুইলের ওপর রাখতেন তাহলে সে যেন স্বস্তি পেত—নিশ্চিন্ত হোতো একটু। কিন্তু না, তিনি তা রাখতে প্রস্তুত নন। অগত্যা প্রাণকেষ্টকে স্বহস্তেই সুকঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। দু'ধারের ট্রামের আওয়াজ যেন বজ্রের মত গর্জন করে উঠে—মুহূর্তের জন্যই। তার শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে। সে চোখ বোজে।—পার হয়েছি? হতে পেরেছি? চেখে খুলে এই কথাই প্রথম সে জিজ্ঞেস করে।

ডাক্তার শুধু বলেন—সাবাস্ !

এতক্ষণে হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এসে পড়লো।—এর পর কী করব ? প্রাণকেষ্ট জানতে চায়।

—কিছু না ! ঝড়ের বেগে চালিয়ে যাও। হুকুম আসে।

চল্লিশ—পঞ্চাশ—ষাট—সত্তর ! গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ফাঁকা রাস্তায় ঝড়ের বেগে গাড়ী চলেছে—স্পীডো-মীটারে সত্তর মাইলের নিশানা।

—এরকম একজন ড্রাইভারের পাশে বসে যাবার সৌভাগ্য জীবনে একবারই হয় ! ডাক্তার না বলে পারেন না।

—আপনি সত্যি বলছেন ? সত্যি ? সে গদ্‌গদ হয়ে পড়ে।

—তোমার ব্রেকের খবর কি ? ব্রেক ঠিক আছে তো ?

—এখনো তো পরীক্ষা করে দেখিনি।

আমি ভাবছিলাম কি—এই স্পীডের মাথায় যদি হঠাৎ তোমায় গাড়ী থামাতে হয়—সামনে কোনো বিপদ বা দুর্ঘটনা দেখা দেয়, কোনো বাধা এসে পড়ে তা হলে কী করবে।

প্রাণকেষ্টর সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। কথাটা ভাববার মত বই কি ! তার শিরদাঁড়া দিয়ে যেন বরফের স্রোত ওঠা নামা করতে থাকে।

—তা হলে কী করতে বলেন ? ক্ষীণকণ্ঠে সে শুধোয়।—সেরকম অবস্থায় কী করব ?

—মনে হচ্ছে অদূরে যেন রাস্তাটা ব্লক করে দিয়েছে—একটা লরী লম্বালম্বি খাড়া ক'রে রাস্তাটা যেন আট্‌কে দেওয়া হয়েছে মনে হচ্ছে। গাড়ীটা থামাও তো এবার।

ডাক্তারের ধারণাই ঠিক। দেখতে দেখতে সেই লরীর বেড়া সামনে এসে পড়েছে, গাড়ী একেবারে লড়ালড়ির মুখেই, আর প্রাণকেষ্টও প্রাণপণে ব্রেক টিপেছে। চার চাকাতেই ব্রেক এঁটে গিয়ে হঠাৎ বিশ্রী এক কেকাধ্বনি—এবং সঙ্গে সঙ্গে গোটা গাড়ীটাই কয়েক হাত লাফিয়ে উঠেছে আকাশে।

—যাক্, বাঁচা গেল। বলেছেন ডাক্তার।

—আপনি যা বলেন! আমার কিন্তু বাঁচনের আশা একদম্ ছিল না। প্রাণকেষ্টও হাঁফ্ ছাড়ে।

ঠিক পাশেই ছিল ওতোরপাড়ার থানা। সেখান থেকে দারোগা, পাহারোলা বেরিরে এসেচে। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়ে সন্দেহজনক এক মোটর গাড়ীর মারাত্মক গতিবিধির খবর একটু আগেই টেলিফোনে তারা পেয়েছিলো। রাস্তা আটকেছিলো তারাই।

থানার দারোগা এসে প্রাণকেষ্টকে পাকড়ালেন—লাইসেন্স দেখাও।

—আমি তো সবে চালাতে শিখছি। লাইসেন্স কোথায় পাবো! প্রাণকেষ্ট বলেছে : উনিই তো মাষ্টার। উনিই আমায় শেখাচ্ছেন।

—আমি মাষ্টার! তার মানে? তুমিই তো আমার মাষ্টার হে! প্রতুলচন্দ্র প্রতিবাদ করেছেন।—খুব শেখালে যাহোক।

—তার মানে? দারোগা এবার প্রতুলবাবুকে নিয়ে পড়েছেন।—আপনার লাইসেন্স দেখান তো মশাই?

—আমার তো মেডিকেল লাইসেন্স—তার সঙ্গে গাড়ী

চালানোর কি ? ডাক্তার প্রতুলচন্দ্র আকাশ থেকে আছাড় খান ঃ এবং তাও তো আমার সঙ্গে নেই। আমার রেজিষ্টার্ড নম্বর বলতে পারি। তাতে কি কিছু সুবিধে হবে ?

—কোথ্ থেকে আসছেন আপনারা ?

—ভবানীপুরের এক মোটর গ্যারেজ থেকে।

—কতক্ষণ আগে রওনা হয়েছেন ?

প্রতুলচন্দ্র ঘড়ি দেখে কাঁটায় কাঁটায় বলে দেন—ঠিক সাড়ে চার মিনিট আগে।

ভবানীপুর থেকে ওতোরপাড়া সাড়ে চার মিনিটে এসেছেন—ঘণ্টায় কতো মাইল বেগে এসেছেন, আপনাদের খেয়াল আছে ? এই রেষ্ট্রিক্টেড এরিয়ায় এরূপ বে-আইনী গাড়ী চালানোর জন্য আপনাদের আমরা সোপর্দ করব—

এমন সময় একটি যুবক দৌড়ে এসে হাঁপাতে লাগল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল—

—এইযে—ডাক্তার রায়! কী ভাগ্যি, আপনি এসে পড়েছেন!—এত তাড়াতাড়ি আপনি আসতে পারবেন, আমরা ভাব্তে পারিনি। আপনাকে ফোন করবার পর থেকে এই ক' মিনিট কি করে যে আমাদের কাটছে! মুখুজ্যে মশায়ের হার্টট্রাবলটা হঠাৎ বড্ড বেড়েছে—প্রায় যায়-যায় অবস্থা। আসুন তাড়াতাড়ি। থানার পাশের তু'খানা বাড়ী বাদ দিয়ে ঐ বাড়ীটাই আমাদের।

টিপ্পনী

মা নিউ মার্কেট থেকে ফিরে দেখলেন ছোট্ট মন্টু তার ছোট্ট আঙুলে ন্যাকড়া জড়িয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধচে।

"কী হয়েছে? কি করে' লাগলো আঙুলে?" ব্যথিত স্বরে মা জিজ্ঞেস করলেন।

"হাতুড়িটা পিট্‌তে গিয়ে লাগলো এক্ষুনি।"

মা অবাক হয়ে গেলেন। "এইমাত্র লেগেচে! কিন্তু আমি ঘরে ঢুকতে তো তোমার কান্না শুনতে পেলাম না। বারে আমার সাহসী ছেলে!"

"কেঁদে কি হবে?" বল্ল মন্টু: "আমি তো জানি তুমি মার্কেটে গেছো আর কেউ এখন বাড়ীতে নেই।"

... ...

"এখানে একটা না-ফাটা বোমা পড়ে রয়েছে। বোমাটার উপর নজর রাখো। কোনো কিছু ঘট্‌লে হুইস্‌ল্ বাজাবে, বুঝেচ?" এ-আর-পির কর্তা যথাস্থানে একজন ওয়ার্ডেনকে মোতায়েন করে' এই কথা বল্লেন।

"আজ্ঞে, হুইস্‌ল্‌টা বাজাবো কখন? আকাশে উড়ে যাবার মুখে, না, নীচে মাটিতে নেমে আসার সময়ে?"

বাকারা কি
গাছে ফলে?

ঐ লোকটাই যে এ-গাঁয়ের বোক্‌চৈতন প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি। রোয়াকে-বসা ভদ্রলোকটি বলে দেবার পর তখন আমার ঠাহর হোলো। দেখলাম, লোকটার গায়ে কালো সার্জের কোট্‌, বিশ বছর আগেকার ফ্যাসান,—আর পরনে ফিন্‌ফিনে কাঁচির কাপড়া যা খুব কম লোকেই (পয়সার অভাবে) আগে পরত কিন্তু কাপড়ের অভাবে এখন পরতে বাধ্য হচ্ছে। তার ওপরে আবার পাম্পশু—পাম্পশু—যা কবে এযুগের সভ্য মানুষ পদচ্যুত করে দিয়েছে—পা থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছে বল্লেই হয়। তা ছাড়া,—তা ছাড়াও তার হাতে আবার ফুলের তোড়া। রোয়াকে-বসা লোকটিই আমায় দেখিয়ে দিলেন।

তথাপি (এসব সত্ত্বেও) লোকটাকে বোক্‌চৈতন বলে আদৌ আন্দাজ করতে পারতাম না, যদি না উক্ত ভদ্রলোক আমার চোখে আঙুল দিয়ে ঐভাবে না দেখিয়ে দিতেন! কারো হাতে ফুলের তোড়া থাকাটা যে তার 'ফুলনেস'-এর বিজ্ঞাপন, আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের পক্ষে তা ধারণা করতে পারা শক্ত ছিল।

সবেমাত্র সেইদিনই সে-গাঁয়ে গিয়ে উঠেছি। দিন কতর জন্যে হাওরা বদলাবার মৎলবে। এবং বোক্‌চৈতনের আটচালার অবস্থা দেখে মনে হোলো তিনিও বেশী দিনের বাসিন্দে নন। তাঁর বাড়ীর সামনের লম্বা লম্বা ঘাস তখনো কাটা পড়েনি, তাতেই বোঝা গেল,—তিনিও অল্পদিনই এখানে এসেছেন।

বোক্‌চৈতন ভদ্রলোক তাঁর আটচালার দ্বারদেশে ফুলের তোড়া নিয়ে বসেছিলেন। বসে বসে যতদূর মনে হোলো, আমার দিকেই তিনি কুটিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে—আমাকেই কৃপা-

কটাক্ষ-পাত করছেন। অন্তত এরকমই ধারণা হোলো আমার।

"বটে বটে?" আমি বল্লাম: "লোকটা বোক্‌চৈতন বুঝি?"

"বোক্‌চৈতন্ বলে বোক্‌চৈতন। এক নম্বরের এক ইডিয়ট। যান্ না, গিয়ে বলুন্ না, ধান গাছ থেকে কড়িকাঠ হয়;—এক্ষুনি বিশ্বাস করবে। যা বলবেন তাই বিশ্বাস করে বসে আছে।"

"তাই নাকি? তা হলে তো—" আমি বলি: "তাহলে তো আস্ত একটা বোক্‌চৈতনই বটে!"

আস্তে আস্তে আমি এগুই। দণ্ডায়মান বোক্‌চৈতনের দরোজা পর্যন্ত এগিয়ে যাই। একটু ভয়ে ভয়েই যাই বলতে কি!

"এই যে—নমস্কার!" হাত তুলতে তুলতে বলি। ভাবের সূত্রপাতে, আর মারামারির সময়ে হাত তুলতেই হয়।

"ডিটো।" বোক্‌চৈতন জবাব দিল: "পুনশ্চ, আর কি! অর্থাৎ কিনা, আপনাকেও—তথাস্তু।"

"একটা অদ্ভুত কথা শুনেছেন? আজকালকার বিজ্ঞানের কাণ্ড! অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানাই বলতে হয়"—আমি আরম্ভ করি: "আমাদের ধানগাছ থেকে নাকি—"

"হ্যাঁ, শুনেছি বই কি!—"বোক্‌চৈতন বাধা দিয়ে বল্ল:"কড়ি বরগা, বীম, চৌকাঠ, চেয়ার, টেবিল, তক্তপোষ—সব বানাচ্ছে। কবে শুনেছি! এ তো বহুদিনের কথা, কেনা জানে?"

আমি একটু দমে যাই—"না, না, সেকথা বলছি না। বহুদিনকার আবিষ্কার—তা সত্যি। কিন্তু ওসব স্থূল জিনিষ নয়, ও তো অনেক আগেই বানিয়েছে। আজকাল ওসবের চেয়েও

ঢের সূক্ষ্ম জিনিস হচ্ছে নাকি ধানগাছ থেকে। এই যেমন—"
কী বলব ভেবে পাই নাঃ—"ধরুন না কেন!—এই ধরণের সব সূক্ষ্ম জিনিস—এই যেমন—"

"এই যেমন ঢাকাই মসলিন্, সেফ্‌টিপিন, অবন ঠাকুরের ছবি।" বোক্‌চৈতন নিজেই বলে দেয়ঃ "এমন কি, আজকালকার গদ্য কবিতা অব্দি—যাবতীয় সূক্ষ্ম জিনিস সমস্তই ধানগাছ থেকে—একথা কে না জানে?"

এবার আমি রীতিমত দমে যাইঃ "তা যা বলেছেন।" আম্‌তা আম্‌তা করে বলি।

"আমারই চেয়ার টেবিল ধানগাছের তৈরি। আসুন না ভেতরে, আপনাকে দেখাচ্ছি।" এই বলে' ভদ্রলোক আমাকে তাঁর আটচালার ভেতরে নিয়ে গিয়ে নিজের ধেনো চেয়ারে বসে তাঁর বোকামির বহর আমাকে দেখালেন।

ধানগাছের প্রসঙ্গে খুব সুবিধা করতে না পেরে আমি অন্য কথা পাড়তে যাইঃ "একটা খবর শুনেছেন কি? যুদ্ধের নতুন খবর? হিটলার নাকি ইংলিশ চ্যানেল জমিয়ে দেবার মতলব করেছে। চ্যানেল জমিয়ে, সেই সেযুগের সেতু-বন্ধের মতো, বুঝলেন কিনা, তার ওপর দিয়ে সৈন্যসামন্ত ট্যাঙ্ক-ম্যাঙ্ক সব কিছু নিয়ে গট্ গট্ করে বিলেতে গিয়ে হাজির হবে।"

"শুনেছি বই কি। তার জন্যে কতো লাখ টন্ বরফের পর্যন্ত অর্ডার দিয়েছে হিটলার। নর্থ পোল্ থেকে সেই বরফ আমদানি হবে। সেখানে ছাড়া অত বরফ আর পাবে কোথায়?

আমেরিকান্ জাহাজে আসবে সেই বরফ। ইংরেজ ব্যাপারীরাই নাকি সাপ্লাই করবে শুনেছি মশাই। বলতে কি, এইটেই আমার সবচেয়ে আশ্চর্য ঠেকছে।—" বলে ভদ্রলোক সামান্য একটু ভুরু কুঁচ্কে সন্দিগ্ধ নেত্রে আমার দিকে তাকালেন: "তা, এমন আশ্চর্যই বা কি? এযুগে সবই সম্ভব, মানুষের পক্ষে অসম্ভব কী আছে? এই জাফরই তো বনে গেলে মীর্জাফর হয়? মীর্জাফর বন্‌তে আর কতক্ষণ? তা ছাড়া, মীর্জাফর বন্‌লেই বা দোষ কি? বীজনেস্ ইজ্ বীজ্‌নেস্। তাই না কি, বলুন না?"

আমি কী বলব ভেবে পাই না।...বোকা বনে' যাই।...

"তা হলেই ভেবে দেখুন, সেই বরফের চাঁই এসে পড়লে কী মজাই না হবে। সমস্ত ইংলিশ চ্যানেল জমে গিয়ে মস্ত একখানা মালাই বরোফ! ভাবতেই আমার কাঁটা দিচ্ছে। তখন কেবল চাঁছো আর খাও। ইংরেজদের পোয়া বারো। দেশ যায় যাক—নিখরচায় বরফ খেয়ে বাঁচবে।" এই বোকচৈতন, দেখতে পাচ্ছি, আমার ওপর দিয়ে যায়। ভদ্রলোকের বোকামির বহরে আমি এমন অবাক হয়ে গেলাম, জবাব দেব কি, আমার মাথার ভেতর বোঁ বোঁ করতে লাগল।

ভদ্রলোক, উত্তর মেরুর বরফের সাহায্যে ইংলিশ চ্যানেল জমিয়েই ক্ষান্ত হলেন না,—সেই অসাধ্য-সাধনেই নিরস্ত হবার পাত্র নন—তারপরেই দু'হাত দিয়ে একটা মাছিকে পাকড়াবার চেষ্টায় লাগলেন। মাছির ম-ও তখন তাঁর ত্রিসীমানায় ছিল না।

অবশেষে, তাঁর যারপরনাই চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে, কপালের ঘাম

মুছবার জন্যে তিনি রুমাল বার করলেন। সেই সময়ে তাঁর পকেট থেকে একটা চিঠি পড়ে গেল।

খামখানা আমি তুললাম। খামের মাথায় বাংলাদেশের এক বিখ্যাত মাসিকপত্রের নাম ছাপানো, এবং তলায় যাঁর নাম লেখা, তিনিও বাংলাদেশের একজন কম নাম-করা লেখক নন। তাঁর অনেক লেখা আমি পড়েছি, পড়ে মুগ্ধ হয়েছি।

বিনামেঘে বজ্রাঘাত হলেও আমি অতটা ঘাবড়ে যেতাম না।

"আপনি? আপনিই? আপনিই মেঘেন মিত্র? কী আশ্চর্য।" চিঠিখানা ওঁর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বল্লাম।

"ঠিকই ধরেছেন। আমি মেঘেন মিত্রই বটে। অদ্ভুত আপনার ধরবার ক্ষমতা—মান্‌তে হয়।"

তখন আমার পরিচয়ও দিতে হোলো ভদ্রলোককে।

"তাই নাকি?" মেঘেন আমার দিকে তাকালেন,—"বটে? তুমিই সেই তুমি?"

"তা, তুমি এতক্ষণ ওরকম বোকা সাজ্‌ছিলে কেন?" আমি জানতে চাইলাম। পাড়াগাঁয়ে বাস করতে হলে বোকা সেজে থাক্‌তে হয় কিনা—সেইটাই নিরাপদ নাকি,—আসলে সেটা জানাও আমার উদ্দেশ্য ছিল।

"তোমাকে নিয়ে একটু মজা করছিলাম", মেঘেন বল্ল: "এই আর কি!" তারপর একটু ইতস্তত করে আসল কথাটা ফাঁস করল মেঘেন: "আমি ভেবেছিলাম যে তুমিই বুঝি এই গাঁয়ের বোক্‌চৈতন! ঐ যে লোকটা রোয়াকে বসে' আছেন, ঐ

ভদ্রলোক, একটু আগে তোমার কথা বল্‌ছিলেন। সত্যি বল্‌তে, তোমার সম্বন্ধে এরকম ভুল ধারণার মূল কারণ উনিই!"

"কিন্তু ও লোকটা আমায় বলেছিল যে তুমিই হচ্ছো সেই চীজ্‌! সেই দুর্লভ বস্তু!' আমিও জানাতে বাধ্য হই: "কে ঐ লোকটা? চেনো নাকি?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"কি করে জান্‌বো!" মেঘেন বলেঃ "আমার এ গাঁয়ে আসার দু'দিন হয় নি এখনো।"

ঐ গাঁয়ের আরেক ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন খালি গায়ে,—কাঁধে গাম্‌ছা—তাঁর কাছে গিয়ে মেঘেন জান্‌তে চাইল। "বল্‌তে পারেন মশাই? রোয়াকে-বসা ঐ লোকটি—কে উনি?"

"রোয়াকে-বসা? উঁহু, রোয়াকে-বসানো, তাই বলুন!" লোকটির খুঁটিনাটির দিকে খর লক্ষ্য দেখলামঃ "রোয়াকে-বসানো ঐ—ঐ লোকটি? উনি হচ্ছেন আমাদের গাঁয়ের বোক্‌চৈতন! উনিই! সবেমাত্র গাগ্‌লা-গারদ থেকে ছাড়া পেয়েছেন!"

"এসো।" মেঘেন বল্ল আমায়ঃ "একটু চা-টা খাওয়া যাক্‌। কিম্বা ডাবের সর্‌বৎ। তোমাদের দু'জনকে পুনরাবিষ্কার করতে যা বেগ পেয়েছি, উঃ!"

গ্রামে একটা ছোটখাট রেস্তরাঁও রয়েছে দেখা গেল। সেখানকার ইতর-ভদ্র সকলেরই সেটা আড্ডাখানা—যাওয়া মাত্রই টের পেলাম। আমাদের চা-পান শেষ হতে না হতে থানার দারোগাবাবুর পায়ের ধূলো পড়লো সেখানে।

মেঘেন তাঁকে বল্ল: "দেখুন মশাই! ওই যে রোয়াকে-বসা

কিম্বা বসানো, যাই হোক্, ওই লোকটিকে দেখছেন, ওঁকে তালা-চাবির মধ্যে রাখাই কি আপনাদের উচিত ছিল না ?"

"ঐ যে—বোস্‌জা মশাই ?" দারোগাবাবুকে একটু যেন বিস্মিতই দেখা গেল : "কেন, কী করেছেন উনি ?"

"করবেন আর কী !" আমি বল্লাম : "তবে কিনা, ওরকম লোককে পাগলা-গারদ থেকে খালাস্ দিয়ে ঠিক করেন নি আপনারা। ওই ধরণের বদ্ধ পাগলদের বাইরে ছেড়ে রাখা খুব নিরাপদ নয়।" খোলসা করেই বল্লাম।

"বোস্‌জা মশাই পাগল কে বল্লে ?" দারোগাবাবু এমন দৃষ্টিতে তাকালেন যেন আমরাই ঐ জাতীয় কিছু হবো ! "কে বল্লে এ কথা আপনাদের ?"

"কাঁধে গামছা এক ভদ্রলোক।" মেঘেন তার অপরাজেয় কথাশিল্পের সাহায্যে, উপরোক্ত সংবাদদাতার নিখুঁত এক বর্ণনা করে দিল।

"ও ! আমাদের পাকড়াশী ! তাই বলুন ! তার কথা ধরবেন না। আমাদের পাড়ার সেই পাকড়াশী—হাঃ হাঃ হাঃ—" দারোগার হাসি আর থামতে চায় না।

"কেন, সে লোকটি কে ?" আমি জিজ্ঞেস করি : 'সেই আপনাদের পাড়ার পাকড়াশী—কে তিনি ?"

"আরে, তার কথা আবার মানুষে ধরে !" দারোগা আমাদের হেসেই উড়িয়ে দ্যান্ : "সেই তো এই গাঁয়ের ইডিয়ট্—এক নম্বরের এক বোক্‌চৈতন !"

চারিয়ে দিও ভাই!

সেযুগে ছাপাখানা ছিল না। কোনো কিছু ছাপতে হলে তখনকার দিনের সব চেয়ে নামী লোকের ছাপ মেরে ছেড়ে দেওয়া হোতো—তাহলেই তা নামজাদা হয়ে মানুষের গলায় গলায় ছাপিয়ে যেত। এই, চণ্ডীদাসের গান! সেকালের যাঁরাই গান লিখে চালু করতে চেয়েছেন তাঁরাই চণ্ডীদাসের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। আর এই করেই না এক চণ্ডীদাস থেকে ভিটামিনের সংখ্যার মতো, এপিডেমিকের আশঙ্কার মতো, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, হরু চণ্ডীদাস এবং নরু চণ্ডীদাস—একে একে কতই না চণ্ডীদাস অতীতের রহস্য থেকে অবলীলায় বেরিয়ে আসছেন! এবং 'Q' বেঁধে আরো কতো চণ্ডীদাস আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন কে জানে!

কিন্তু এখন যেকালে মুদ্রাযন্ত্রই আছে এবং মুদ্রারও তত অভাব নেই—তখন আর যন্ত্রণা বাড়ানো কেন? আমি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করে দেব, এই কথাই পরিতোষকে জানিয়ে দিলাম।

পরিতোষ হাঁ হাঁ করে উঠল—উঁহুহু, তা হয় না, তাতে কাজ হয় না। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে কি কেউ বিশ্বাস করে? চারিয়ে দেবার নিয়ম ও নয়। কোনো কিছু পৃথিবীময় ছড়াতে হলে তার নিয়ম হচ্ছে, তোমার কাছাকাছি লোকটির কানে কানে জানিয়ে দাও, ব্যস্! তাহলেই দেখবে কানাকানি হতে হতে সবার জানাজানি হয়ে গেছে। দেখবে, দেখতে না দেখতে বাতাসের মত চারিয়ে পড়েছে চার ধারে।

আমি বল্লাম—আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে, তথাস্তু।

বল্লাম না বলে' প্রায়-বল্লাম বল্লেই ঠিক হয়, কেননা ঐ-কথাটা বলতে গিয়ে যে-কথাটি আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল তাকে ভদ্রভাষায় উন্মুক্ত করা যায় না।

বল্লাম ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁহ্যাঁ-হ্যাঁ—চ্চোঃ ! আমার মুখের ভাষা, আমার মুখাপেক্ষা না করে নাকের ভেতর দিয়ে মুখর হয়ে এল।

এবং বলতে কি, এই ঘরে ওর আসা অবধি আমাদের বাক্যালাপের বেশীর ভাগ—আমার জবানী যা কিছু—অনুনাসিক ভাষাতেই হয়েছে। ঐ একবাক্যেই মুক্তকণ্ঠে ওকে আমি অভ্যর্থনা করেছিলাম—"আরে, আরে, পরিতোষ যে! এসো এসো!—কেমন আছো?" সংক্ষেপে, এক কথায়···"হ্যাঁচ্‌চো!"

আমার হাঁচিরা ঐ রকম! একবার এসে হাজির হলে আমাকে আর একটি কথাও বলতে দেয় না। বলতে দেওয়া দূরে থাক, একবার চলতে সুরু করলে···অনেকটা মালগাড়ীর মতই...ওর আর শেষ দেখা যায় না। চলেছে তো চলেইছে!

"সর্দিতে বেজায় কষ্ট পাচ্ছো দেখচি। দাঁড়াও, সারিয়ে দি।"

"সারিয়ে দেবে? বলো কী?" আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

তা, শঙ্কিত হবার কথাই বইকি! একবার খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে সর্দিঘাতক এক ওষুধের সন্ধান পেয়েছিলাম। কোথাকার পাইনবনের জলহাওয়া জমাট-করা যতো ট্যাবলেট। কিচ্ছু তোমায় করতে হবে না, যেম্‌নি তোমার গা ম্যাজ ম্যাজ করছে, কি নাক ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ সুরু হোলো, অম্‌নি তার একটা ট্যাবলেট তোমার গলার কাছে রেখে দাও,—না, না, মাদুলির মতো নয়,—গলার বাইরে না,—তোমার কণ্ঠস্থলেই বটে, তবে

গলগর্ভে। অবশ্যি, এভাবে একটা ট্যাবলেটকে গলদেশে ধারণ করা,—ধরে জিইয়ে রাখা,—খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার। গলার কাছে রেখে, গলিয়ে না দেয়া—একেবারে গিলে না ফেলা ভারী শক্ত। বিশেষতঃ, আমার মতো অকম্মারা, মুখস্থ-বিদ্যায় যারা পটু নয়, তাদের জিভে পৌঁছানোর সাথে সাথে যে কোনো জিনিস কি করে' যে পেটের মধ্যে চলে যায়, টেরই পায় না তারা।

হ্যাঁ, কী বলছিলাম, সেই ওষুধ? ওইতো, তারপর আর কি, গুলিটাকে গলার উপকূলে রেখে দাও, পারো যদি। অমনি, রাখামাত্রই, তোমার মধ্যে পাইনবনের আবহাওয়া খেলতে সুরু করবে। আর পাইনবন ইচ্ছে করলে, সর্দি তো সর্দি, সর্দির বাবা টি-বি পর্যন্ত সারিয়ে দিতে পারে। শিশির গা-লাগা বিজ্ঞপ্তি-পাঠেই তা জানা যায়। কতক্ষণ রাখবে?—গলার কথা বলা মুস্কিল—কার গলা কদ্দূর ভারসহ কে জানে,—তবে যাবৎ না ওই গুলিরা আস্তে আস্তে ফের পাইনবনের জল-বায়ুতে পরিণত হয়ে বিন্দুবাষ্পও অবশিষ্ট থাকছে না, তবক্ষণ তো বটেই!

কিন্তু দুঃখের কথা বলব কি ভাই, গ্রহের ফের বলাই উচিত। একদিন সর্দির আমেজ দেখা দিতেই উক্ত পাইনবন-জমানো দুটি ট্যাবলেটকে তো গলগ্রহ করেছি—সামান্য একটু সর্দি! পাইনবন উপস্থিত যখন, উপে গেল বলে'। ও মা, বলব কি, ট্যাবলেটের মহিমায় দেখতে না দেখতে তা প্রবল হাঁচিতে দাঁড়িয়ে গেল। হাঁচি সামলাতে যাই তো ট্যাবলেট সামলাতে পারি না, আর ট্যাবলেট সামলাতে গেলে হাঁচা কঠিন হয়ে পড়ে। ট্যাবলেটরা

হাঁচির সাহায্যে মুখের পথ দিয়ে মুক্তপথে বেরিয়ে যেতে ব্যস্ত—আর এদিকে তাদের গলায় গলায় রাখতে আমার প্রাণ কণ্ঠাগত। যাহোক, মুখ বুজে, কোনোগতিকে, নাকের মারফতে হাঁচবার এক কায়দা বার করে দুদিক সামলে নিজের মধ্যে পাইনবনের জলহাওয়া তো প্রবাহিত রাখলাম। সেই জোলো হাওয়া মন্দমধুর গতিতে আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসে যাতায়াত করতে লাগল, এবং আমিও প্রায় আশ্বস্ত হতে যাবো, এমন সময়ে, ও মামা, একি, হাঁচির সঙ্গে কাশি এসে হাজির হয়েছে কখন্! হাঁচির লাইনে কাশি—এ আবার কি? শুধু কাশির ইষ্টিশনই নয়, হাঁচি-কাশির জংশনই নয় কেবল, উভয়ের কুরুক্ষেত্র হয়ে দেখা দিল একাধারে।

তবু আমি নাছোড়বান্দা, বটিকাদের চালিয়ে গেলাম। তারাও একটার পর একটা হাওয়া হয়ে যেতে লাগলো, আর এধারেও, কাশির পর গয়ার, গয়ারের পর বুকব্যথা, তারপর ইন্‌ফুলুয়েঞ্জা—পরম্পরায় আমদানি হতে থাকলো। ইন্‌ফুলুয়েঞ্জার পরে এল ব্রংকাইটিস, তার ওপরে দাঁড়ালো নিউমোনিয়া—

কিন্তু যাই বলো, ওষুধটার সারাবার ক্ষমতা অসাধারণ—ক্রমেই তার পরিচয় পেলুম। ইন্‌ফুলুয়েঞ্জা তো সেরেই গেছল, কিন্তু ব্রংকাইটিস এসে পড়ল কিনা! তবে ট্যাবলেট আমি ছাড়িনি, চালিয়ে গেছি বরাবর, এবং ব্রংকাইটিসও আমার সেরেছিল বলেই মনে হয়। কিন্তু নিউমোনিয়াটা এসে পড়ল আবার—

কিন্তু ওষুধের কোনো দোষ নেই। কেননা নিউমোনিয়াও সেরে গেল ঐ এক ওষুধেই। তখন ফিরে ফিরতি আবার সেই পুরনো সর্দি এসে হাজির। আমিও পাইনবন ছাড়ার পাত্র না—

টেনেই চল্লাম ট্যাবলেট—তখন হোলো কি—ঘুরে ঘুরতি আর ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি নয়, কাঁচা সর্দি শুখিয়ে টানের সুখ হয়ে দেখা দিলো এবার! সর্দি আরাম হোলো বটে, কিন্তু আমার আরাম হোলো না। সেই সুখটান চরমে হাঁপানি হয়ে দাঁড়ালো—পুরো শিশিটা গললগ্নীকৃত হওয়ার সাথেসাথেই!

পাইনবনের বিকল্প থেকে শনৈঃ শনৈঃ কিভাবে নির্বিকল্প সমাধির মুখে গিয়ে ঠেকেছিলাম আমার আগেকার সেই আরোগ্য-সমাচার পরিতোষকে দিলাম। পাইনবনের হাওয়া কেমন মৃতুমন্দ সুরু হয়ে শেষে সোঁ সোঁ করে বইতে লাগল—হাঁপানির টানের সময়টায়—এবং কীভাবে তার গতিবিধি ক্রমশঃ ঝঞ্ঝাবাতে গড়িয়ে অচিরে আমাকেই পাইনবনে পরিণত করল—পাইন্‌ড্‌ হতে হতে অবশেষে আমি নিজেই কখানা বোনে গিয়ে পুঞ্জীভূত হলাম—পরিষ্কার করে বল্লাম ওকে।

বল্লাম: "ভাই, সেই পাইনবন ওরফে পেটেন্ট গুলি সেবনের পর থেকে সর্দি সারাতে আর আমার সাহস হয় না।"—খোলাখুলি বলে' দেওয়াই ভালো—"তাছাড়া, সেই হাঁপানি—হাঁপানিকে আমার ভারী ভয়! অন্য ব্যামোয় শুইয়ে দেয়, সেকথা মানি, কিন্তু হাঁপানি? হাঁপানি একেবারে বসিয়ে দেয় ভাই! শুতেও দেয় না একটু,—বরাবর বসিয়ে রাখে। হাঁপাতে আমি আর পারব না।" সকাতরে ওকে জানালাম।

"আরে, এ কোনো গুলিগোলা নয়, আমাদের দিশী দাবাই।" শিশি থেকে খানিক সর্ষের তেল বাটিতে ঢেলে রোদে দিয়ে বল্‌লো পরিতোষ: "আর কিছুনা, সূর্যপক্ক

সর্ষপ তৈল। ত্যাখো না, কী করি এই দিয়ে। তবে একটা কথা, যদি এতে উপকার পাও—পেতেই হবে উপকার—তাহলে ভাই, আরো তু' দশজনের মধ্যে এটা চারিয়ে দিতে দ্বিধা কোরো না। • এই অনুরোধ।"

এই বলে, সেই রৌদ্রতপ্ত তেলের এক খাবলা নিয়ে প্রথমেই আমার কণ্ঠায় লাগালো। তারপর, তার তৈলাক্ত তুটি আঙুল আমার নাকের মধ্যে চালিয়ে বল্লে: "টানো, টানো বেশ করে'।"

নস্যির মতো, তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ আমি টানতে লাগলাম, হাঁচবো যে, তারও যো রইলো না। এমনি রঙ্গ, নাকের সুড়ঙ্গ-পথে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বালা করতে লাগল, কিন্তু উপায় নেই।

তারপরই তার তেলের হাত পড়লো আমার পিঠে। মেরু-দণ্ডের গ্র্যাণ্ডকর্ড লাইনের ওপর দিয়ে, বোম্বে মেলের মতো উর্ধ্বশ্বাসে তারা আসা-যাওয়া করতে লাগল। কণ্ঠায় তেল নিয়ে উৎকণ্ঠায় ছিলাম, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে হোলো না, উত্তর-দক্ষিণ মেরুর সঙ্গে, সেখানেও দলাই-মলাই সুরু হয়ে গেল।

সব শেষে ও পড়লো আমার পা নিয়ে। আমার তুই পায়ের তালুদেশ—না, তলদেশ? পায়ের সেই সুখতলা পাকড়ে তেলের মালিশ লাগিয়ে দিল জোর। কারো পদসেবা আমার ধাতে সয়না, কেমন সুড়সুড়ি লাগে। আমার অনিচ্ছা-সত্ত্বেই পদাঘাতে তিন তিনবার ওকে ধরাশায়ী করে ফেল্‌লাম, তবুও সে নাছাড়বান্দা।

পরিতোষের পদ্ধতিতে সর্দি সারানো সহজ ব্যাপার না—যে সারায় আর যার সারায় তুজনেই কাহিল হয়ে পড়ে। এতক্ষণ আমাকে টুঁ-শব্দও করতে দেয় নি, হাঁচির ছলেও না। চিকিৎসার

এমনি দাপট, হাঁচি তো হাঁচি, অমন যে কাশি, দৌদণ্ড যার প্রতাপ, সর্দির অনুসরণে স্বভাবতই যে এসে পড়ে—সে অবধি মুখ খুলতে সাহস পায় নি। সর্দি আমার বেমালুম সেরে গেছে বলেই সন্দেহ হতে লাগল। শুধু সর্দি কেন, তেলপড়ার তাড়সে সমস্ত আধিব্যাধিই আমার পালিয়েছে—এক তেল ছাড়া আর কোনো উপসর্গই আমার দেহে নেই। কিন্তু বলব কি, এতক্ষণের গজকচ্ছপ-যুদ্ধে, আমিও যেমন তেল্‌তেলে হয়েছি, ওরও তেমনি যায়-যায় অবস্থা!

হ্যাঁচ্‌চো···! তৈললাঞ্ছিত হাতে কপালের ঘাম মুছে ও হাঁপ ছাড়ল।...না, না, আমি নয়, আমি হাঁচি নি, ওর হাঁপ ছাড়ার আওয়াজ এল কানে!

আর ওর নাক দিয়ে টস্‌টস্ করে গড়াতে লাগল। আমি পরীক্ষা করে দেখলাম, তেল নয়, জলই বটে, এবং ওর চোখ দিয়ে পড়ছে না।

আরও দেখা গেল—নাকের অশ্রুপাতে পরিতোষ মোটেই পরিতুষ্ট নয়।

ওর এতক্ষণের শুশ্রূষায় আমি যে-আরাম পাইনি, সেই আরাম পেলাম এতক্ষণে। ওর অনুরোধ রাখতে পেরেছি, চারাতে পারা গেছে, একজনকেও অন্ততঃ চারিয়ে দিতে পেরেছি···ওকেই।...

আর, এতক্ষণে আমি যথার্থ পরিতোষ পেলাম—বলতে কী!

সবার ধার ধারতে নেই!

বসে আছি আড্ডাখানার এক কোণে—একলাটি। কেউ এসে জমেনি তখনো। ভাবলাম এই ফাঁকে আরাম চেয়ারটায় লম্বা হয়ে এক চোট্ ঘুমানো যাক্…চোখের পাতা বুজেছি কি বুজিনি, ভুঁইফোড় দৈত্যের মতন দীপেন এসে হাজির!

"বনস্পতিকে দেখেছো?" সে খোঁজ করে।

"নাঃ, চার ধার সাফ্,—মাভৈঃ।" আমি ভরসা দিলাম।

"এসেছিলো কি আসেনি?" দীপেন তথাপি নাছোড়।

"আমি তাকে চোখেও দেখিনি, এমন কি, কানেও শুনতে পাইনি—এখানে আসা অবধি।" আমি জানালাম।

"তাহলে তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে আমায়।" দীপেন বসে পড়লো।—"অন্ততঃ একবারটিও সে এখানে আসবে। আড্ডা দেবার খাতিরেও অন্ততঃ। রোজই তো আসে—তাই না?"

আমি একদৃষ্টে দীপেনকে তাকাই।—"তুমি অপেক্ষা করবে—ওর জন্যে?" ভাবতেও আমার তাক লাগে। কেউ যে সাধ করে বনস্পতির ধার ধারতে চায় সে দৃশ্য আমার জীবনে এই প্রথম।

"হ্যাঁ।" গম্ভীর মুখে ও ঘাড় নাড়লো।—"বনস্পতির সঙ্গে দেখা আমার না হলেই নয়।"

"হেতু?" রহস্যটা আমি পরিষ্কার করতে ভালোবাসি।

"কদিন আগে গোটা পঁচিশেক টাকা ওর কাছে আমি ধার করেছি। টাকাটা"—বল্‌তে গিয়ে দীপেনের আটকায়।

ধার করা দীপেনের এক বিলাসিতা। সেকালের বীর কেশরীদের যেমন হরিণ-শিকার করে' স্ফূর্তি হোতো, ওর তেমনি এই ঋণ-শিকার। এক রকমের মৃগয়াই আর কি!

অবশ্য, ওর পক্ষে মৃগয়া হলেও আমাদের কাছে টাকাগুলোর গয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এই তো সেদিন, বৃষ্টি পড়ছে টিপ্ টিপ্ করে', এক মাসিকে গল্প বেচে কিছু টাকা পেয়েছি, রাস্তার মোড়ে দীপেন এসে পাকড়ালো।—"ভাই, ভারী বিপদ! গোটা দশেক টাকা দিতে পারো? ধার চাচ্ছি।"

দিলাম। দীপেন নোটখানাকে আলগোছে নিয়ে পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে' তার পুঁজির মধ্যে রাখলো।

"য়ঁ্যা, য়্যাতো টাকা? তোমার আবার টাকার দরকার?" আমি তো অবাক্।

"একি আর আমার টাকা? সব পরের। ধারে কাট্‌ছি বইতো না।" দীপেন জানায়। পুঞ্জীভূত দীপেন!

ধারানো কিম্বা হারানো—সেই দশ টাকার শোক এখনো আমি ভুলি নি। কিন্তু বনস্পতির ধার ঘেঁষা তো অতো সহজ না। সে যে আরো ধারালো। আমার বিস্ময় লাগে।—"ধার দিলো বনস্পতি?!"—প্রশ্নের সঙ্গে আমার বিস্ময়ের চিহ্ন।

"দিলো। তিনটে বাজতে দশ, তখন চেয়েছিলাম—আর পাঁচটা বেজে কুড়ি, তখন পেলাম।" সে দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে।

"অনেক বলতে হোলো বুঝি?"

"আমি? না, আমি না। আমাকে কিছু বলতে হয়নি—ঐ টাকাটা একবার মুখফুটে চাওয়া ছাড়া—" দীপেন সকাতরে জানায়ঃ "একটা কথাও আমায় বল্‌তে হয়নি।"

"খুব বকলো বুঝি? তোমার এই ধার করা বদভ্যাসের জন্যেই বোধহয়?"

"বকলো বলে বকলো। যেমন বকুনি তেমনি বুকনি—তেমনি আবার বর্ণনা। তবে বদভ্যাস টদভ্যাস নয়—সেধার দিয়েই না। বনজঙ্গলের ব্যাপার সব।"

আমি বুঝতে পারি। বনস্পতি প্রকৃতিরসিক। বিশ্ব-প্রকৃতির লীলায় সে মাতোয়ারা। গাছ-পালা, ঝিলজঙ্গল, বনবাদাড় তার কাছে প্রাণের মতন। চাই কি, প্রাণের চেয়েও প্রিয়! এমনো দেখেছি, যখন সে বনমুখো নয়, তখনো সে বনের বিষয়ে মুখর। ওর বনস্পতি নামডাক তো এই জন্যেই। ওকে শোনা মানেই বনমর্মর শোনা। সহরে বসে' অরণ্য-বাস!

"তোমায় একলাটি পেয়ে বুঝি খুব বলে নিলো? ওর সব বন্য অভিযান-কাহিনীই বোধকরি—?"

"শুধুই কি বন্য অভিযান? আরো কতো! বনের লাবণ্য পর্যন্ত। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম যে বুঝি ও জংলীদের দেহ-সুষমার কথা বল্‌ছে, পরে বুঝলাম তা নয়, জংলী নয়, জংলীদের কোনো কথাই না, স্রেফ জঙ্গলের রূপ-গুণের বর্ণনা, শুধু জঙ্গল। কিন্তু ভাই, বনের লাবণ্য যে কী, তা তো আমার মাথায় ঢোকে না। কলকাতার বাইরে কোনো বুনো জায়গায় তো যাইনি কখনো। তুমি নিশ্চয় বন দেখেছো, তুমি বল্‌তে পারো।"

"বন? বন বলতে আমি কেবল নিজের বোন দেখেছি। কিন্তু এত করে দেখেও তার মধ্যে কোনো লাবণ্য দেখতে পাইনি।" আমি বিনিকে স্মরণ করি।

"আরে, নিজের বোন হলেও তো বাঁচতাম। সে তো মার পেটের বোন—তার মতো কী আছে! কিন্তু তা নয়, খালি

পরের বনের কথা। এর পরে আরো কী কী বনে বেড়াতে যাবে, কোন্ সব বন এখনো তার না-দেখা রয়ে গেছে তারই ফিরিস্তি।"

"আড়াই ঘণ্টা ধরে তারই আড়ম্বর ?"

"হ্যাঁ, আড়াই ঘণ্টা একটানা আওড়ালো। আওড়ানো বলে আওড়ানো! সে কী বলারে ভাই—আর কথার কী তোড় রে বাবা। কতো কথাই যে বল্লো! বাপ্স্!"

"কথকতাও বলতে পারো।" আমি বলি : "তাও বলা যায়।"

"কী করব ? চাওয়া মাত্রই এক কথায় টাকাটা দিতে রাজী হয়েছিল বলে শেষপর্যন্ত সব আমায় সইতে হয়েছে।"

আমি বলি—"আহা!" এবং আরো বলি—"তা হলে তো ঐ পঁচিশ টাকা তুমি উপার্জন করেছো বলতে হবে। কায়-ক্লেশেই কামিয়েছো। কানের ক্লেশে ছেলেরা বিদ্যার্জন করে, তুমি অর্থ উপায় করলে। একে তো ধার বলে না। তুমি ওকে কান দিয়েছো—তোমার একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ! তার কি কোনো দাম নেই ? হাতের খাটুনির চেয়ে কানের খাটুনি কি কম হোলো ? কানের দ্বারা কাজ দিয়ে তার বিনিময়ে ঐ টাকা তোমার ন্যায্য পাওনা। ঐ রোজকার রোজগার।"

"কাজ ? কেবল কাজ ? এমন কষ্টকর কাজ আমি জীবনে করিনি। পঁচিশ টাকা উপায় করতে এর চেয়ে যন্ত্রণা কখনো আমাকে পোহাতে হয়নি। আর কান ? কানের কথা বোলো না। হাতে না মলেও যে হাতেনাতে কানমলা যায়, তার প্রমাণ সেইদিন পেলাম।" দীপেন ফোঁস ফোঁস করে।

"তা হলে ফের আবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছো কেন?" আমার আশ্চর্য লাগে আরও।

বিস্ময়ের কথাই বাস্তবিক। দীপেন দুবার কখনো একজনের কাছে ধার করে না। একবার ধার করলে সে-ধারে না মাড়ানোই ওর স্বভাব। তাকে ভুলে যাওয়াই দস্তুর। শোধার কোনো কথাই নেই—ওর কুষ্টিতে।

তা হলে সত্যিই বোধহয় ওর খুব ঠেকা! তা নইলে কি সাধ করে' ফের বনস্পতির অরণ্যে রোদন করতে এসেছে? বিনা বাক্যব্যয়ে এবং কেবল বাক্যব্যয়ের খাতিরেই—এক বনস্পতি ছাড়া আর কে এ বাজারে টাকা ছাড়ে?

দীপেন ঘাড় হেঁট করে' থাকে। কিছু বলে না।

আমি বুঝতে পারি। "মানে, আর কারো কাছ থেকে কিছু বাগাতে পারোনি বুঝি? তাই এমন করে দাবানলে—জ্বলন্ত বানপ্রস্থে যেতে প্রস্তুত হয়েছো? আহা, আমিই তো তোমায় দিতে পার্‌তাম—" বলেই ক্ষণিক দুর্বলতার জন্য নিজের মনে নিজের কান মলে দিই—"কিন্তু এম্‌নি হয়েছে ভাই, কী বলব! কদিন থেকে টাকাকড়ির মুখ দেখতেই পাচ্ছিনে—"

"সত্যি কথা শোনো!" বাধা দিয়ে দীপেন বলে: "টাকাটা ওকে আমি ফেরৎ দিতে এসেছি।"

"য়্যাঁ-া-া-া-া-া—?" আমি চম্‌কে উঠি! দীপেন এসেছে পরিশোধ করতে! নিজের কানকে বিশ্বাস করা কঠিন হয়।

"হ্যাঁ। টাকাটা আমি ওকে ফিরিয়েই দেব।" দীপেন একেবারে মরীয়া।

"তাহলে মনি-অর্ডার করে' পাঠিয়ে দিলেই পারো। সেইটেই নিরাপদ। তোমার কি কানের মায়া নেই ?"

"না, মনি অর্ডারে এ-টাকা শোধ দেয়া যায় না।" দীপেনকে উদ্দীপ্ত দেখি।

"বটে ?" আমি ওর মুখের দিকে তাকাই।

"ভেবে ছাখো," দীপেন ব্যক্ত করে ঃ "ও আমার কাছে পঁচিশ টাকার ঢের বেশী পায়। সমস্ত আমি সুদে আসলে শুধবো—কড়ায়-গণ্ডায়। বন-জঙ্গলের বিষয় আমার বিশেষ জানা নেই তা ঠিক, তবে বাহান্নটা গোপাল ভাঁড়ের কেচ্ছা আমি মুখস্ত করে এসেছি। সব বনস্পতিকে শোনাবো। তার ওপরে আমার ছোট ছেলেটা—সবে তার কথা ফুটছে—সারাদিন যা যা বলে আমার স্মৃতিপটে আঁকা হয়ে থাকে। সেই সব আবোল-তাবোলও ওকে শুনতে হবে। তার পরে এই ছাখো—" পকেট থেকে সে বিদ্যাসাগরের উপক্রমণিকা টেনে আনে ঃ "এর থেকে একটার পর একটা সবগুলো শব্দরূপ আমি আউড়ে যাব। নরঃ নরৌঃ নরাঃ থেকে সুরু করে'।"

শব্দরূপের সামনে বনস্পতির জব্দরূপ আমি মানসপটে দেখি। মনে হয় ওই যথেষ্ট। দীপেন কিন্তু সেখানেও থামে না।

"তার পরে আবার।" বলে' আরেক পকেট থেকে আরেক গ্রন্থ সে বার করে,—"এই ছাখো, তিপ্পান্নটা স্ন্যাপ্‌শট্‌। সারা জীবন ধরে যতো স্থানে অস্থানে ঘুরেছি তার নিদর্শন। এইগুলি একে একে দেখতে হবে। আর এদের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে যতো ভূগোল আর ইতিহাস আর কিম্বদন্তী জড়িত রয়েছে তার সব

বৃত্তান্তও শুনতে হবে ওকে। বাহান্নটা গোপাল ভাঁড়, তার ওপরে এই তিপ্পান্নটা ছবি—কেমন হবে?"

দীপেনের চোখে মুখে জিঘাংসার প্রতিচ্ছবি।

"যাঁহা বাঁহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। মন্দ হবে না।" আমার উৎসাহ হয়—"এরই নাম প্রতিশোধ—যাকে বলে, কড়ায় গণ্ডায়।"

ঠিক সেই মুহূর্তে বনস্পতির ছায়া দ্বারপথে দেখা দ্যায়। আমরা চোখ তুলে তাকাই,—সেই বটে।

"মাভৈঃ!" দীপেনের কানে কানে অভয় দিয়ে আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে পড়ি। কায়দা করে বনস্পতির পাশ কাটিয়ে—ওর বনদের মায়াপাশ এড়িয়ে বেরিয়ে আসি বাইরে!

দুঘণ্টা বাদে আড্ডায় উঁকি মারতে গিয়ে দেখি, দীপেন নিঃঝুম মেরে আছে। আছে কি নেই বোঝাই যায়না। চেয়ারে বেবাক্ পর্যবসিত—বনস্পতির চিহ্ন নেই কোথ্থাও।

"কী? কদ্দূর? কিরকম শোধ নিলে?" আমি জিগেস করি।—"মানে, শোধ দিলে,—সেই কথাই বলছি।"

হাতী দ'য়ে পড়লে কিরূপ হয় কখনো দেখিনি। কিন্তু দীপেনের কিম্ভূতকিমাকার থেকে তার কিছুটা আঁচ যেন পাওয়া যায়। ঘাড় তুলে পাগলের মত চোখে ও তাকায়। দীপেনের জায়গায় আমি মূর্তিমান the painকে দেখতে পাই।

"না ভাই।" গোঙাতে গোঙাতে ও বলে: "দিতে পারিনি। তার কথার তোড়ে—বল্‌ব কি, তার নোট কখানা ফেরৎ দেবার পর্যন্ত ফুসরৎ পেলাম না।"

শিক্ষাদান

জনশিক্ষাদানের খুব হুজুগ চলছিলো সেই সময়ে।

আমাদের পাড়াতেও তার হিড়িক্ লেগেছিল। আর সেই হিড়িকে আমিও ভিড়ে গেছলাম।

না ভিড়ে উপায় কি? পাড়ার চারধারেই শিক্ষার ডিম পাড়া হয়েছে। কোথাও চুব্ড়ি বুনতে শেখানো হচ্ছে, কোথাও বা হিন্দি-শিক্ষা; কোনোখানে মূর্তিশিল্প, কোথাও আবার স্বাস্থ্যতত্ত্ব। একজায়গায় অর্থনীতির ব্যাখ্যা, আরেক-জায়গায় রাজনীতির ভাষ্য। চারধারেই ভিড়! শিক্ষায়-শিক্ষায় ছয়লাপ! তাদের একটাকে না মাড়িয়ে পাড়ার কোনো ধারে পা ফেলার যো নেই।

আমাকেও দুয়েকটা ডিমে তা' দিতে হচ্ছিলো—কিন্তু বল্‌তে কি, অন্য ডিমের থেকে বিদ্যার ডিমে যে বেশ প্রভেদ, তা আমি অল্পদিনেই টের পেয়েছিলাম। অন্য ডিমের থেকে, এমন কি দুধের থেকেও, একসময়ে ছানা পাবার ভরসা থাকে, কিন্তু শিক্ষার ডিম চিরদিন ডিমের শিক্ষা হয়েই থেকে যায়। অন্ততঃ, আমার তো এইরূপ ধারণা জন্মাচ্ছিলো।

তাহলেও আশায় মানুষ বাঁচে। আশাতেই খাটে। তা' এবং শিক্ষকতা দানা বেঁধে একদিন ছানা হয়ে উঠবে, হাঁসমুর্গি আর গুরুদের এইতো আশা। গোরুদের মনস্কামনাও তো ঐ।

আমাদের পাড়াতে জনশিক্ষা-সমিতির সেক্রেটারী আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। যেতেই আমাকে একচোট্ নিলেন। আমার বাসার পাশের বস্তিতেই নাকি এক আকাটমুখ্যু রয়ে গেছে আর আমি নাকি একেবারে সে-দিকে নজর দিইনি!

"আমারই বাড়ীর পাশে আকাট!—" আকাশ থেকে পড়ি।

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ—আকাট বলে আকাট! নিজের নামটা পর্যন্ত বানান করতে জানে না। যাকে বলে, রামমুখ্যু!"

কথাটা আমার কাছে মোটেই আরামপ্রদ নয়।

তিনিও সেটা বোঝেন। বুঝে বলেন—"না না, আমি রাম-মুখ্যু বলে তোমার প্রতি কোনো কটাক্ষপাত করছি না। তোমাকে মুখ্যু বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়া, তুমি হাজার মুখ্যু হলেও তোমাকে কি সেকথা আমি বলতে পারি? তোমার মুখের ওপরেই কি তা কখনো বলা যায়? তুমিই বলো?"···

বাসায় ফিরেই বস্তির খবর নিলাম। খোঁজ নিলাম সেই আকাটের। নাম তার বেশ তাক্-লাগানো এবং দেখা গেল, নামের বানান সত্যিই তার জানা নেই, মানে তো দূরে থাক্! শিক্ষালাভের তার যারপর নাই দরকার সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

কিন্তু শিক্ষালাভ করা তার পক্ষে সহজ নয়। পাশের বস্তিতে থাকলেও কেন যে সে চোখের আড়ালে থাকে তারও কারণ জানা গেল। বস্তির লোকেরাই জানিয়ে দিলো।

মাঝে-মাঝে সে ডুব মারে—দিনকতকের জন্য। কোথায় যে যায় বলা যায় না। তারপর ফিরে এলে দেখা যায়, পুলিশ তাকে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জেল-হাজত খেটে ফিরে এসে দুদিন বাদে আবার সে উধাও! এবং ফের আবার ফেরৎ আসতে না-আসতেই পুলিশ!

এবং আবার হাতেনাতে কড়াকড়ি! মানে, এককথায়, আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটার ওপরেই রেকারিং ডেসিমল্!

এরকম হরদম্ যাতায়াতকারী ছাত্রের কাছে যে রেগুলার্

অ্যাটেন্‌ডেন্‌সের ভরসা নেই, বস্তির সকলেই সেকথা আমার কাছে ফরসা করে রাখলো। তাহলেও পার্থকে ডাকলাম।

"শুনছি, তুমি নাকি লিখতেও জানো না। পড়তেও পারোনা?"

"না মশাই।" ঘাড় উঁচু করে সে জানালো—গর্বের সঙ্গেই।

"একথা তো ভাল কথা নয়। খুব নিন্দের কথা। এত-খানি বয়েস অবধি মুখ্যু হয়ে থাকার মতো দুঃখু আর কী আছে? লেখাপড়া শিখতে তোমার ইচ্ছে করে না?"

"সব-কিছুই একবার আমি বাজিয়ে দেখতে রাজি।" সে বল্লে।

"বাঃ, এই তো বেশ কথা! খাসা কথা!" আমি বল্লামঃ "লক্ষ্মী ছেলের মত কথা। বেশ, কাল থেকে রোজ এক সময়ে আমার বাসায় আসবে। তোমাকে আমি পড়াবো,—কেমন?"

পার্থ এলো। রোজই আসে। কিন্তু এলে কি হবে, পড়ানো ওকে ভারী মুস্কিল। আমার ব'কে মরাই সার, কোনো কথায় ও কান দেয় না। অ আ পড়তে ও পড়বে ও আ। হ্রস্ব ই-র পরে পড়বে দীর্ঘ ঊ। যতই ওকে বলি যে, ও আছে ও-ও আছে—কিন্তু আছে অনেক পরে। গোড়ায় যা আছে তা হচ্ছে স্বরে অ। কিন্তু অ ওর মুখে কিছুতেই সরে না।

ও আ হ্রস্ব-ই দীর্ঘ ঊ-তেই রেহাই নেই, ঋ আর ঌ-কে ও একাধারে উচ্চারণ করতে ইচ্ছুক। ওর মুখে পড়ে ওদের আর পৃথক্ সত্ত্বা নেই, একেবারে রিলিঃ। কিন্তু ঐভাবে পড়লে যে হতভাগা পড়ায় সে কি কোনো রিলিফ পায়?

এবং এ ছাড়াও আছে। ঐ-কে সে আদপেই আমল দিতে

নারাজ। যতই বলি এ ঐ—ততই বলে এ এই। এই এক বিপদ! তার ওপর, আরো ফ্যাসাদ, ঔ-কেও ও মানবে না—বল্‌বে আও! দীর্ঘ ঈ আর হ্রস্ব উ-র কোনো বালাই ওর নেই। ওর কাছে ওদের বহুলতা বাহুল্য মাত্র।

বর্ণপরিচয়ের প্রথম পরিচ্ছেদ ওর স্বরলিপিতে দাঁড়ায় এই ঃ ও—আ—হ্রস্ব ই—দীর্ঘ উ—রিলিঃ—এ—এই—ও—আও!

আও তো বটে, কিন্তু এরকম আও বলে' তাল ঠুক্‌লে দেবী স্বরস্বতী কি সাহস করে এগুবেন?

তবু আমার কোনো কসুর নেই। প্রাণপণে পড়িয়ে চলি। ঘষতে-ঘষতে একদিন পাথরও ক্ষয়ে যায়, পার্থও ক্ষইবে, এই আশা। কিন্তু ব্যর্থ আশা, পার্থ সে পাত্রই নয়। লেখাপড়ার সারাক্ষণ সে এমন গোঁজ মেরে বসে থাকে যে, মনে হয় যেন তার সঙ্গে ঘোরতর শক্রতা হচ্ছে। শিক্ষাদান যে একটা অপার্থিব ব্যাপার, ক্রমশই আমার সেই বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়।

এহেন যখন অবস্থা, পাড়ার ডাক্তার আমায় তাড়া করলেন। তিনিও জনশিক্ষা-সমিতির একজন। বল্লেন—"তোমাকেই খুঁজছিলাম। আমাদের এক ছাত্র এসেছিলো আমার কাছে—পার্থ তার নাম। বলছিল, রাত্রে তার ঘুম হয় না। তোমার শিক্ষাই নাকি তার কারণ। ঘুমোলে কেবল বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি স্বপ্ন ছাখে আর আতঙ্কে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়।"

"কিসের স্বপ্ন ছাখে?" আমি জিগেস করি।

"ছাখে কিম্ভূত-কিমাকার যতো লোক তাকে তাড়া করছে।"

"কী ধরণের লোক?"

"তা আমি জানিনে।" বল্লেন ডাক্তার। "তবে সেই লোকগুলো তাকে বই ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারে। পার্থ বলে পুলিশের মার সে অকাতরে সয়েছে, তাতে তার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়নি, কিন্তু এই বইয়ের মার অসহ্য। বলে এই ভয়ে সে বিয়েই করলো না।"

"বইয়ের সঙ্গে বিয়ের কী?" আমি অবাক হই। বই আর বৌয়ের মধ্যে কী সম্পর্ক থাকতে পারে আমি ভেবে পাই না।

"বইয়ে আর বউয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে মনে হয়।" জানালেন ডাক্তার: "তা যে পাকাবে তার আশ্চর্য কি? সাতদিন সাত রাত্তির বেচারার ঘুম হয়নি, পাগলের মতো চেহারা। পাগল হতে তার দেরি নেই—দেখলেই বোঝা যায়।"

"আমারই বা পাগল হতে বাকী কী!" মনে মনে বলি।

"অতো বেশি লেখাপড়ার চাপ দিয়োনা। স্বাস্থ্য আগে, তারপর সব—জানোতো? যতটা রয়-সয় ততটাই ভালো।"

ডাক্তার ছেড়ে দিতেই সমিতির সভাপতি পাকড়ালেন—"বলি ক'দ্দূর এগুলো? অ আ ক খ লিখতে পারে?

"না মশাই।"

"লিখতেও শেখেনি, পড়তেও শেখেনি, তবে কী শেখাচ্ছো?"

"শিখতে ওকে রাজি করতেই বেগ পেতে হচ্ছে কিনা। তাই একটু দেরি হচ্ছে। তা, ওকে আমি তৈরি করে নেব।"

"নাও চট্‌পট্। ওরাই আমাদের দেশের মাটি। ভালো ক'রে চ'ষে যদি সার ছড়াতে পারো তাহলে ঐ মাটিতেই একদিন ফসল ফলবে। ঐ মাটিই সোনা হবে। মানব জমিন্ রইলো

পতিত, আবাদ করলে ফল্‌তো সোনা,—বলেছেন রামপ্রসাদ। তাঁর সাধ অপূর্ণ রেখোনা। সোনা ফলাও—সোনা ফলাও।”

সোনা ফলাও! বলা সহজ, শোনাও কঠিন নয়—কিন্তু কী করে ফলানো যায় সেই সমস্যা! উনি তো ফলাও করে বল্লেন, বলেই খালাস! কিন্তু যার ফলার, সেই জানে। তবু যাহোক, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো। যদি শিক্‌-কাবাব্‌ খাইয়েও ওর শিক্ষাভাব দূর করা যায়, তা করতেও পেছপা হব না।

লেখাপড়ার পড়া এখন থাক্‌, লেখার দিক নিয়েই সুরু হোক্‌। লেখা দেখা আর দেখে লেখা—তাই থেকেই আরম্ভ করা যাক। নিজেই নামটাই লিখতে শিখুক্‌ আগে।

আগে নিজের নাম সই করুক। নিজের নামে কার না রুচি? নামের মোহ একবার ওর জন্মালে নাম জাহির করার লোভও ওর হবে। ক্রমশঃ নামজাদা হবার ইচ্ছা ওকে পেয়ে বস্‌বে। নামের লোভে লোকে লেখক হয়, লেখক প্রকাশক হয়ে পড়ে,—পার্থ কী আর পড়ুয়া হতে পারবে না?

বাসায় ফিরে দেখলাম, পার্থ মুখ গোমড়া ক'রে ব'সে আছে।

“আচ্ছা, তুমি নিজের নাম সই করতে জানো?”

পার্থ ঘাড় নাড়লো।—“কই করোতো দেখি।”

খাতা কলম নিয়ে, পার্থ একটা জিনিস আঁকলো—অনেকক্ষণ ধরে'। মুখ কুঁচকে ওর কপালের শিরা আর হাতের পেশী ফুলে উঠ্‌লো—ওই একখানা সই বাগাতেই।

সইটা দেখে তো আমি অবাক্‌! যোগের এক-পা-ওয়ালা

চিহ্নকে দুপায়ে দাঁড় করালে যা দাঁড়ায়, তাইঃ প্লাস্কে ইন্টু করা হয়েছে।

"এতো গুণের চিহ্ন! তবে তোমার গুণের কোনো চিহ্ন কি না বলতে পারিনা।" আমি বল্লামঃ "একে তো ঢেঁড়া-সই বলে।"

একটা কাগজে 'শ্রীপাথ´' লিখে ওকে দেখালাম—"এই হচ্ছে তোমার নাম। ঠিক এইরকম করে লেখো দেখি।"

লেখাটা দেখে ও চম্কে উঠ্লো। তাহলেও, হাত বাড়িয়ে নিল কাগজখানা।

"আস্তে-আস্তে দুরস্ত করবে। কোনো তাড়া-হুড়া নেই। তোমার সুবিধেমত, ইচ্ছেমত, ফুরসৎমাফিক্ একটু-একটু করে করলেই হবে। যদ্দিনে পারো, এই সইটা বাগিয়ে আনো। কেবল এই তোমার পড়া রইলো। কেমন? আর হ্যাঁ,—এ নিয়ে বেশি ভেবোনা। আহারে-বিহারে শয়নে-স্বপনে ভাববার মতন এমন কিছু নয়—স্বপ্নে তো নয়ই! বুঝেচো?"

এক সপ্তাহ বাদে সে এলো—পড়া তৈরি করে' একেবারে। দেখলাম, শ্রীপার্থ সে নিখুঁত ক'রে লিখেছে—আমার হস্তাক্ষরেই যদিও—তাহলেও, ঠিক যেমনটি লিখে দিয়েছিলাম—অবিকল। তাছাড়াও,তার খাতার আগাপাশতলা পার্থময় দেখা গেল—সারা খাতাভর্তি শ্রীপার্থ! নামের এই বহর দেখে মোটেই বিস্মিত হলাম না—নামমাহাত্ম্য যাবে কোথায়?

"আমার নামটা ইংরাজীতে সই ক'রে দিন্ না পড়বো।"

য়্যাঁ, বলে কী! পার্থের পড়ায় মন? ওর এই অপার্থিব

লালসায় আমার উৎসাহ দ্বিগুণ হয়ে উঠলো। তক্ষুনি ওকে নতুন পড়া দিয়ে ফেললাম।

এবার তিনদিন পরে পার্থ হাজির। দুখানা পাতাজোড়া ওর নামাবলি এক-গাল হাসির সঙ্গে খুলে দেখালো।

এর পর থেকে 'মুর্গি ডিম পাড়ে', 'ঘোড়ায় ঘাস খায়', 'কারো পকেট কাটা ভালো নয়', 'হিন্দু মুস্‌লিম্‌ এক হো', এইসব বড়-বড় কথা ওকে লিখতে দিলাম—দেখা গেল, ঠিক-ঠিক সে লিখে এনেছে—এক চুল এদিক-ওদিক হয়নি। বাহাদুর পার্থ!

পার্থর উন্নতির খবর পেয়ে জনশিক্ষাসমিতির সভাপতি সাধুবাদ জানিয়ে আমাকে এক চিঠি লিখেছিলেন—সেখানা সগর্বে ওর মুখের ওপর মেলে ধরলাম।—"দেখেচো, কী কী লিখেচেন উনি?"

পার্থ দেখলো। দেখে বল্ল, "এঁর লেখাগুলো ঠিক আপনার মতো না—গোটা-গোটা নয়। কেমন ইক্‌রি-মিক্‌রি।"

"বাঃ, ইংরেজীতে লিখেচেন যে। দেখচো না?"

পার্থ চিঠিখানা আমার হাত থেকে নিলো—বেশ সাগ্রহেই নিলো।—"আচ্ছা, এই চিঠিখানা আমি পড়বো এবার? দেখি পারি কি না।"

"পারবে। খুব পারবে! পৃথিবীতে না পারবার মতো কী আছে? সমস্তই গাছের ফল—ফলাও হয়ে হাতের নাগালে ধ'রে রয়েছে—পড়ুয়ার গালে পড়ে ধন্য হবে বলে'—ধ'রে পাড়লেই হোলো।" এই ব'লে ওকে উৎসাহ দিই।

তারপর আর অনেকদিন ওর পাত্তা নেই। চিঠিখানা পড়া

(কিম্বা পাড়া) ওর পক্ষে সহজ ছিলনা, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেইভয়েই কি সে পাড়া ছাড়লো নাকি ?

অবশেষে একমাস বাদে—না, পার্থ নয়। তার খবর এলো। কোন্ এক ব্যাঙ্কে সভাপতিমশায়ের সই জাল, ক'রে সপ্তম বার টাকা তুলতে গিয়ে সে ধরা পড়েছে।

সভাপতিমশাই মুখ কালো করে আমার কাছে এলেন—"এই তোমার কাজ ? জনশিক্ষার নামে দুর্জনশিক্ষা চালানো হচ্ছে ? পাড়ার সবাইকে জালিয়াতি করতে শেখাচ্ছো ? বটে ? তোমাকেও পুলিশের ধরা উচিত। ধরে কিনা দেখা যাক্।"

চুপ করে শুনে গেলাম, কিছু বল্লাম না।

কিন্তু পার্থ বল্ল। আমার কাছ থেকেই তার শিক্ষালাভ সেকথা সে ব্যক্ত করলো অকপটে। কোনো কথাই অস্বীকার করলো না।

আমার কাছ-থেকে পাওয়া তার পাঠ্য-পুস্তক—সভাপতির স্বাক্ষরিত সেই চিঠিখানাও সে থানায় দাখিল করেছে। আর বলেছে,—"আমি লিখতে জানি না। একদম্ না। তবে কেউ কিছু লিখে দিক্—"

বলতে গিয়ে তার মুখ নাকি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল বলে' শোনা যায়ঃ—"হ্যাঁ, কেউ কিছু লিখে দিক্। আমি ঠিক-ঠিক তার নকল করে দেবো।"

এই বলে তার সেই কবুলতির তলায় সে নিজের নাম সই করেছে—একটা ঢেঁড়া দিয়ে। সেটা আমাদের গুণের চিহ্ন—তার আর আমার গুণপনা। যাকে বলে, ঢেঁড়া পিটিয়ে কীর্তি জাহির !

শিক্ষালাভ

না, মাস্টারি করতে আমার ভালো লাগে না।

বিদ্যে বেশি নয় বলে যে বাধা তা নয়। বিদ্যের জন্যে বাধে না, অল্পবিদ্যাই ভয়ঙ্কর বিদ্যা হতে পারে—মাস্টারির পক্ষে অন্ততঃ। কিন্তু শিক্ষা দিতে গিয়ে উল্‌টে যদি শিক্ষালাভ করতে হয় সেটা কি কখনো কারুর ভালো লাগে,—কেউ বলুক!

একবার কিছুদিনের জন্যে একজনের বকলমে আমাকে মাস্টারি করতে হয়েছিল—উঃ! সেকথা এখনো আমি ভুলতে পারিনি। আমার মেমারি খুব কম হলেও তার স্মৃতি, কাঁকড়া-বিছের মতো, এখনো মাঝে-মাঝে আমাকে কামড়ায়!

এখনো আমি ইস্কুলের স্বপ্ন দেখি, সেকথা সত্যি। বই বগলে পড়তে যাচ্ছি, বেঞ্চির উপরে দাঁড়িয়ে ক্লাসের শোভাবর্ধন করছি, মাস্টারের হাতে কানমলা খাচ্ছি, খাতা-কলমে এগ্‌জামিন দিচ্ছি—এসব দৃশ্য দেখে থাকি এখনো। আমার কাছে সুখস্বপ্নই!

কিন্তু—কিন্তু মাস্টারির দুঃস্বপ্ন কখনো আমি দেখি না।

শিক্ষাদান মহৎ ব্রত, কেউ কেউ বলে থাকেন! কিন্তু সেই মহত্ত্ব বাঁচাতে গিয়ে একদা যা বিব্রত আমাকে হতে হয়েছিল—!

আমার এক বন্ধু ছিলেন ইস্কুল-মাস্টার। অসুখে পড়ে আমাকে বদ্‌লি দিয়ে মাসখানেক ছুটি নিয়ে তিনি দেশে গেলেন।

ছুটি বলে ইস্কুল-মাস্টারের কিছু নেই। দশটা-পাঁচটা ইস্কুলতো আছেই—তার ওপরে এবেলা-ওবেলা টিউশানির ছুটোছুটি।

আমাল বন্ধুটি বোধহয় ছুটির সুখ আরো বেশি করে উপভোগ করার মানসেই আমার মাস্টারি পাকা করে দিয়ে ইহলোক আর সেই ইস্কুলের সব বালকের মায়া কাটালেন।

আমি লেখক বলে আমাকে ওঁরা বাংলার মাস্টার করে দিয়েছিলেন। লেখক হওয়া সত্ত্বেও নির্ভুল যতগুলো বাংলা বানান আমার জানা ছিল, ওখানে পড়াতে পড়াতে তার প্রায় সমস্তই আমি ভুলে গেলাম। এক একটা শব্দের যে কতদূর সম্ভাবনা আছে, কতগুলো বানান হতে পারে, কতরকমে তাদের বানানো যায়, তা এগ্‌জামিনের খাতা না দেখলে জানা যায় না। এক পৃথিবী বানানই আমি আটরকমের দেখেছি—প্রত্যেক ছেলের মাথাতেই পৃথিবী বানাবার স্বতন্ত্র আইডিয়া। কেউ যদি পৃথিবীর বানান ফট্‌ করে আমাকে এখন জিগ্যেস করে আমি চট্‌ করে হয়তো বলতে পারব না—সেই ক'দিনের মাস্টারির দৌলতে আমার যত্ব-ণত্ব-জ্ঞান অবধি নেই।

কেবল বানানই নয়, ব্যাকরণ ছিল আরেক বিভীষিকা। ওদের খাইয়ে আর সিনেমা দেখিয়ে দেখিয়েই ফতুর হবার দশা হোলো। "পথে বেরুলেই অম্‌নি নমস্কার সার্‌"—আর ওদের নমস্কারের সারাংশের মর্যাদা রাখতে গিয়ে আমার জীবন আর পকেট দুই একেবারে অসার হয়ে পড়ল।

তবু ছেলেদের নিয়ে আমার কেটে যাচ্ছিল কোনোগতিকে—কিন্তু মাস্টারিটা আমার টিক্‌লো না। ছেলেরা আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখলে কী হবে, একজন মাস্টারের দুর্ব্যবহারের জন্যেই ওখানে কাজ করা শেষ পর্যন্ত আমার পোষালো না।

দুর্ব্যবহার বলতে আমরা যা বুঝি ঠিক তা না হলেও, আমার সঙ্গে ব্যবহারে তিনি যেরকম দূরত্ব বজায় রাখছিলেন, তাতে ওকে ওছাড়া আর কী আখ্যা দেওয়া যায় আমি জানি না।

ভদ্রলোকের নাম এখন আমার মনে নেই। তাঁকে আমরা গড়গড়ি বলতাম। তিনি ছিলেন সেকেণ্ড মাস্টার। শিক্ষা দিতে ওস্তাদ্ বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। প্রৌঢ় মানুষ, আমাদের হেড মাস্টারের চেয়েও বয়সে ভারী। এবং একেবারে সেকেলে!

একমাত্র তিনি ছাড়া আর সবার সঙ্গেই আমার বেশ জমেছিল। হেড মাস্টারও ছিলেন চমৎকার। কিন্তু এই গড়-গড়িটি কিরকমের যেন! কিছুতেই তাঁকে একটা কথাও আমি কওয়াতে পারিনি—কিছুতেই না! এহেন অ-মিশুক লোক আমি জীবনে দেখিনি। আর যেন কখনো দেখতেও না হয়!

মাস্টারদের বসবার ঘরে তাঁর টেবিলে তাঁর মুখোমুখিই আমায় বসতে হোতো। আর এমন খারাপ লাগত আমার! মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে অথচ একটা কথা নেই! আমার মতো আড্ডাবাজের পক্ষে সেটা যে কী কষ্টকর, তা শুধু আমিই জানি।

অবিশ্যি, কয়েকবার আমি কথা পাড়বার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বৃথাই, গড়গড়ি গায়েই মাখে না, আমলই দেয় না আমায়! উচ্চবাচ্য করা দূরে থাক্, নমস্কার করলে প্রতি-নমস্কার পর্যন্ত নেই! রীতিমতো অকথ্য ব্যাপার!

অবশেষে আমি হাল ছেড়ে দিলাম। বল্লাম নিজের মনে মনেই—আর তোমার পায়ে গড়াগড়ি দিয়ে আমার কাজ নেই। গড়গড়ি, তোমায় গড় করি! তুমিও যদি চুপ্‌চাপ্ থাকো তো আমিও চুপ্‌চাপ্। তোমার সঙ্গে কথা না বল্লেও আমার ভাত হজম হবে। তোমার সাথে কথা বলবার জন্যে কেউ আমায়

মাথার দিব্যি দেয়নি। দরকার হয় বরং আমি গড়গড়া টানব, কিন্তু তোমাকে টানাটানি করার আমার এত কী গরজ ?

দিব্যি আমিও মুখ ভার করে দিন কাটাতে লাগলাম। হঠাৎ একদিন হোলো কী, অদ্ভুত ব্যাপার, গড়গড়ি অযাচিত গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। অবাক্ কাণ্ড !

মাস দেড়েক তখন আমার মাস্টারি চল্‌ছে। আমি ইস্কুলে যাচ্ছি। সেদিনও লেট্ হয়েছে, হন্তদন্ত হয়ে ছুটেছি। মোড়ের মাথায় পৌঁছে দেখি,—গড়গড়ি দাঁড়িয়ে! গড়গড়ি দাঁড়িয়ে! ইস্কুল বসে গেছে কখন্—তবু গড়গড়ির গড়িমসি—কোনো তাড়া নেই। রাস্তার মোড়ে ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়ে। অসম্ভব দৃশ্য--ভাবতেই পারা যায় না। দেখে আমার রোমাঞ্চ হোলো।

আমাকে দেখে তিনি একটু হাসলেন। তাঁর হাসি দেখে নিজের তাড়ায় আমি লজ্জা পেলাম ! আমিও দাঁড়ালাম। কিন্তু তখনো আমার ধারণা হয়নি যে আমার জন্যই তিনি দাঁড়িয়ে।

কেবল হাসিই নয়, গড়গড়ির মুখে কুশল-প্রশ্ন আবার !

—"এই যে, শরীর বেশ ভালো তো?" আমাকে তিনি সম্ভাষণ করলেন। কী স্নেহবিগলিত স্বর গড়গড়ির! স্বকর্ণে শুনতে হোলো আমায় ! ইহলোকে—আমার এই চর্মকর্ণেই !

"খাসা !" আমি বল্লাম—"আপনিও ভালো বেশ ?"

বাহুল্য প্রশ্ন। এবং তার অনাবশ্যক জবাব। তাহলেও প্রথম ভাব জমাবার মুখে মৌখিকতা দিয়েই সুরু করতে হয়—দোস্তির এই দস্তুর। এই লৌকিকতা ! কাজেই আমিও তাঁর কুশল-জিজ্ঞাসার প্রতিশোধ নিতে কসুর করলাম না।

প্রশ্নপর্ব সেরে গড়গড়ি আমার গলা জড়িয়ে ধীরে ধীরে স্কুলের দিকে এগুতে লাগলেন। আমিও গড়গড়ির দ্বারা জর্জরিত হয়ে তাঁর সঙ্গে তাল রেখে চললাম। দুজনেরই বেশ গড়িয়ে।

স্নেহভরে আমাকে টেনে নিয়ে তিনি বল্‌তে বল্‌তে চল্লেন—"একটা কথা তোমাকে বলব ভায়া—কিছু যদি না মনে করো—"

গড়গড়ি কথা বল্‌ছে—আমার সঙ্গে! গড়গড় করে বল্‌ছে! নিজের কানকে বিশ্বাস করতে না পারলেও কথাগুলো সেখানেই এসে গড়াতে লাগলো।

"না না, কী মনে করব! মনে করাকরির কী আছে?" আমি গদ্‌গদ হয়ে গেলাম ঃ "কিচ্ছু আমি মনে করিনি। ভেবে দেখলে, আপনি এই স্কুলে অনেক দিন রয়েছেন। আপনি একজন প্রধান শিক্ষক। আর আমি হালের আম্‌দানি। ঠিক হাল থেকে না এলেও এখনো আমি ততটা গুরুত্ব লাভ করিনি। (গুরুত্বটা উচ্চারণ করতে গিয়ে প্রায় গোরুত্ব হয়ে দাঁড়ালো) তাই, ভেবে দেখলে, আপনার সঙ্গে আমার ঠিক সমান তালের সম্পর্ক তো নয়। তা আমি বুঝি। আর তাই আমি কোনোদিন কিছু মনে করিনি। আপনিও কিছু মনে করবেন না, এই আমার অনুরোধ।"

"না না—সে সম্বন্ধে আমি কিছু মনে করিনি।" তিনি বল্লেন।

"হ্যাঁ, তাই। তাই বল্‌ছিলাম। ও নিয়ে মনে করবার কিছু

নেই। তারপর আজ যখন আমাদের ভাব হয়ে গেল—এই সৌহার্দ্য স্থাপিত হোলো, তখন আজ থেকে সেকথা অতীতের কথা। আপনিও সেকথা ভুলে যান, আমিও ভুলে যাই।"

এই বলে আমিও গড়গড়িকে—এক হাতে যতদূর নেয়া যায় —আমার যথাসাধ্য জড়িয়ে ধরলাম।

মোড় থেকে ইস্কুল কাছেই। কাজেই জড়াজড়ি করে যাবার বেশী পথ ছিল না। এবং তার সময়ও ছিল না। তাছাড়া, বিজড়িত হয়ে গড়গড়িকে একটু যেন বিমনাই দেখা গেল! কেমন যেন তিনি মুষড়ে পড়লেন—কোথায় যেন তাঁর বাধ-বাধ ঠেক্‌ছে —এম্‌নি আমার মনে হতে লাগলো।

যাই হোক্, আমরা পায়ে পায়ে ইস্কুলের দিকে এগুচ্ছিলাম। ওদিকের গির্জার ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। আর এদিকে গড়গড়ি ফের বোবা মেরে গেছেন। ইস্কুলের ঐটুকু পথ আমাদের কথোপকথন আর তেমন জম্‌লো না। আমিই যা কথা কইছিলাম—তিনি শুধু হুঁ হাঁ দিয়ে সারছিলেন।

তারপর ইস্কুলের গেটে পা দিয়েই তিনি ধাঁ করে ফিরে দাঁড়ালেন—গির্জার ঘড়িটার দিকে তাকালেন একবার। তখন বারোটা বাজো-বাজো!—"ঐ যাঃ! লেট্ হয়ে গেল আজ্‌কে।" দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন গড়গড়ি।

"তা—একদিন লেট্ হলে কী হয়!" আমি উৎসাহ দিয়ে ওঁর বেদনা লাঘবের চেষ্টা করি।

"আজ পঁচিশ বছর এই ইস্কুলে মাস্টারি করছি, এর আগে একদিনের জন্যও আমার লেট্ হয়নি।" গড়গড়ি জানালেন।

"বলেন কি মশাই!" আমি চমৎকৃত হই : "এতো দস্তুরমতো একটা রেকর্ড! আমি তো এই মাস দেড়েক মাত্তর কাজ করছি, কিন্তু এর মধ্যেই আমার অন্ততঃ দিন দশেক লেট্ হয়ে গেছে।"

বলতে কি, আমার রেকর্ডটা বেশ একটু কমিয়ে-সমিয়েই বলতে হোলো। পাছে উনি আবার লজ্জা পান্!

আমার কাঁধে তাঁর হাতটা তিনি রাখলেন—"আমি তা জানি। এবং···এবং এই···এই কথাটাই···" আম্‌তা-আম্‌তা করে অবশেষে কথাটা না বলে তিনি আর পারলেন না—"এতক্ষণ ধরে এই কথাটাই তোমাকে আমি বলতে চাইছিলাম।"

বীমার
বদলে বোমা!

রাস্তায় কি ঘাটে কিম্বা খেলার মাঠে কোথায় ঠিক মনে নেই, জনৈক লোকের সঙ্গে একবার আমার আলাপ হয়েছিল। লোকটিকে ভদ্রলোক বলেই ভেবেছিলাম, কিন্তু তিনি যে আমার এমন বন্ধু হয়ে উঠবেন তা আমি আশঙ্কা করিনি। এখন দেখছি কেবল বন্ধু নন—তিনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষীও বটে। যাতে আমার ভালো হয় তাই করাই তাঁর মৎলব।

যারা পরের ভালো চায়, প্রায়ই দেখা যায় যে তারা পরার্থ-পর। এই ভদ্রলোকটিকেও তাই দেখা গেল। সেই সামান্য আলাপের সূত্র ধরে তিনি আমার বাড়ীতে এসে হানা দিয়েছেন। আমার জীবনবীমা না করে' নড়বেন না।

কিন্তু আসলে, জীবনবীমা করতে আমার উৎসাহ হয় না। প্রথমতঃ নিজের জীবন আছে কিনা সেই সংশয়। দ্বিতীয়তঃ জীবন থাকলেও, এবং তাকে ধরে বেঁধে কোনোরকমে রাখা গেলেও, জীবনবীমাকে আমি রাখতে পারব কিনা সেই সন্দেহ আমার আরো গুরুতর।

তাছাড়া আরেক কথা। বীমা-দালালদের আমি দুচোখে দেখতে পারি না। তারা ভারী মিথ্যে কথা বলে। তারা বোঝায় যে যেকোনো মুহূর্তেই আমি মারা যেতে পারি—এইজন্যেই বীমাটা আমার করা দরকার। যেহেতু বীমা করে' মরতে পারলে বেশ একটা মোটা টাকা আমার হাতে হাতে লাভ হবে, এই কারণে বীমা না করে বেঁচে থাকাটা বিড়ম্বনা। কিন্তু তারা ভুল বোঝায়। তাদের কথায় ভুলে লোভে পড়ে সরল বিশ্বাসে দুএকবার নিজের বীমা করেছি, করে ঠকেছি।

এমন কি, কয়েকটা প্রিমিয়ম্‌ও টেনেছিলাম, আশায় আশায় দু এক মাস কাটানোও গেছল—কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! মরবার আমার নামটি নেই! লোকে কতো অনর্থের জন্যে প্রাণ দেয়, আমি অর্থলাভের জন্যে প্রাণ দেব—মরিয়া হয়ে রয়েছি, কিন্তু এম্‌নি পোড়া কপাল, কিছুতেই মরিনি। মরলে তো দাঁও মারবো? আর, খতম্‌ না হতে পারলে ক্ষতির বোঝা বাড়ানো বইতো না।

ভাগ্যলক্ষ্মী আমার প্রতি নিতান্তই অপ্রসন্ন দেখা গেছে। (ভাগ্যসরস্বতীই বা এমন ভালো কী?) যাই হোক্‌, বীমার দিক দিয়ে আমার বরাত খুলবে বলে এখন আর আমার বিশ্বাস নেই।

নাঃ, বীমার দৌলতে বড়লোক হওয়া অদৃষ্টে নেই আমার। এইভাবে বারম্বার বিফলমনোরথ হয়ে আমি কখনো মারা যাবো কিনা সেই আমার এখন ভয়। যদি এখনো এইরকম আরো পাঁচশো কি হাজার বছর আমায় বাঁচতে হয় তাহলেই তো আমি গেছি! অদ্দিন ধরে' জীবনবীমার প্রিমিয়ম্‌ টান্‌তে টান্‌তে যেতে হলেই আমার হয়েছে। তা আমি চাইনে! নিজে ফতুর হয়ে চতুর বীমাকোম্পানাকে বা তার দালালকে লাল করার মতো লালসা—অতোখানি আহ্লাদ আমার নেই।

অবিশ্যি, আমার বন্ধুটি আমাকে ভরসা দিতে কসুর করছেন না। বলছেন, যা দিনকাল, মিলিটারি লরি এবং গুণ্ডামির যেরূপ বহর—প্লেগ্‌ প্রভৃতির যেমন মরশুম্‌—তাতে কপাল খুললে, চাই কি, তেরাত্রির মধ্যেই আমি পটল তুলতে পারি।

কিন্তু তাঁর কথায় আমার আস্থা হয় না। জীবন সম্বন্ধে আমার ঘোরতর অবিশ্বাস জাগরূক। এবং জাগাটা কিছু

অস্বাভাবিক নয়। সত্যি বলতে, কদাচ আমি মারা গেছি বলে তো কখনো আমার মনে পড়ে না।

অনেক আবাল্যসুহৃদের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে —এই বীমার ব্যাপারেই। কেন যে বলা যায়না, একে একে তারা বীমার দালাল হয়ে যেতে লাগল। এবং তাদের প্রথম কোপটা সবার আগে আমার ঘাড়ে বসাতে এল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে দ্বিধাবিভক্ত করতে না পেরে (আমার দ্বিধা থেকে সহজে আমাকে বিভক্ত করা যায় না) আমার প্রতি তাদের বন্ধুসুলভ বিভক্তি চটে গেল। তাদের তদ্ধিতপ্রত্যয় নিয়ে আমাকে ত্যাগ করে' তারা চলে গেছে, কোপান্বিত হয়ে কোথায় গেছে জানিনে।

কিন্তু সেদিনের আলাপী এই লোকটির সঙ্গে আমি চটাচটি করতে চাইনে। এ যখন বন্ধু নয়, এবং বাল্যকালের আম্‌দানি না, তখন এর সঙ্গে ঝগড়া করব কোন দুঃখে ? এবং কোন মুখেই বা করব ? ওঁর অস্ত্রেই ওঁকে ঘায়েল্ করা যায় কি না—সেই চেষ্টাই বরং দেখা যাক।

ভদ্রলোককে চা রুটি খাইয়েছি। কান দিয়ে আর মন দিয়ে ওঁর সমস্ত কথা শুনলাম। জীবনবীমা করার লাভালাভ এবং গুণাগুণ কিছুই আর আমার অগোচর নেই। ওঁর প্রায় কথায়ই আমি সায় দিয়েছি। সত্যি বল্‌তে, আমার জীবনের প্রতি আমার চেয়েও তাঁর বেশী মায়া, বেশী লোভ দেখা গেল। নিজের চেয়েও আমার এত বড়ো দরদী আর কে আছে ? আমার সামান্য জীবনকে ইনিই প্রথম আদর করলেন, দর দিলেন। অথচ, ভেবে দেখলে, লোকটি তোমার অনেক কালের বন্ধু নয়—

আমার উত্তরাধিকারীও না—আমার চোদ্দপুরুষের কেউ না—আর কোথায় ক' মিনিটেরই বা আলাপ!

অনেকক্ষণ ধরে বহুৎ বলে' কয়ে' ভদ্রলোক আমায় ছেড়েছেন। ছেড়ে গেছেন অবশেষে। জীবনবীমার একখানা আবেদনপত্র তিনি রেখে গেছেন—সেই সঙ্গে এক গাদা প্রশ্ন! যথাযথ উত্তর দিয়ে প্রিমিয়ম্-সহ আবেদন করলেই আমার জীবন বীমাবদ্ধ হবে।

আমি এই জিনিসটারই অপেক্ষায় ছিলাম। সত্যিই যদি ওঁদের কোম্পানী আমার সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জানতে চান্—জানাতে আমি দ্বিধা করব না। নিজের কথা সাত কাহন বলতে কার না ভালো লাগে? কিন্তু শোনে কে! সত্যি, তাঁদের কৌতূহল চরিতার্থ করতে আমার কোনই আপত্তি নেই। নিজের বিষয়ে যতদূর আমার জানা আছে, যথাসাধ্য জানাতে আমি প্রস্তুত।

তাঁদের প্রত্যেক জিজ্ঞাসারই আমি স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব দিয়েছি। কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিনি। আমার উত্তরকাণ্ড থেকেই, আমার ধারণা, আমার বীমার যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারবেন। চিরদিনের মতই তাঁদের কৃপাদৃষ্টি থেকে আমি রেহাই পাবো আমি আশা করি।

প্রশ্ন। আপনার বয়স কতো?

উত্তর। সাতাশও হতে পারে, সাতাশীও হতে পারে—এর মাঝামাঝি যা খুসি ভাবতে পারেন। 'বয়েসকে ধরা ভারী কঠিন! যদি ২৭ সংখ্যাটায় আপনার অরুচি থাকে, উল্‌টে ৭২ করে নিন্—আমার কোনো আপত্তি নেই।

প্রশ্ন। কোন্ সালে জন্মেছিলেন ?

উত্তর। এটা এত আগের কথা যে কিছুই আমার মনে পড়ে না। (জন্ম থেকেই আমার স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ আর বিস্মৃতিশক্তি ঘোরতর)।

প্রশ্ন। আপনার ছাতির মাপ কী ?

উত্তর। আমার ছাতি নেই, মাপ করবেন—বুকের ছাতি আঠারো ইঞ্চি মাত্র।

প্রশ্ন। বুক ফোলালে কতোটা বাড়ে ?

উত্তর। আধ ইঞ্চিটাক্। গাল ফোলালেও ঠিক তাই।

প্রশ্ন। উচ্চতা কত আপনার ?

উত্তর। পাঁচ ফুট ছ ইঞ্চি—যদি খাড়া হয়ে দাঁড়াই। কিন্তু হামাগুড়ি দিলে তার চেয়ে কিছু কম দাঁড়াবে।

প্রশ্ন। আপনার ঠাকুর্দা কি মারা গেছেন ?

উত্তর। ঠাকুরদাই জানেন।

প্রশ্ন। মৃত্যুর কারণ (যদি মারা গিয়ে থাকেন) ?

উত্তর। হার্টফেল্—বোধহয় (যদি মারা গিয়ে থাকেন)।

প্রশ্ন। আপনার পিতৃদেব কি মৃত ?

উত্তর। আজ্ঞে, হ্যাঁ। তাঁকে আর দেখতে পাই না।

প্রশ্ন। তাঁর মৃত্যুর কারণ ?

উত্তর। সম্ভবতঃ আমি। (আমার ভাবনা ভেবে ভেবেই তিনি মারা গেলেন মনে হয়)

প্রশ্ন। মামারা কি মারা গেছেন ?

উত্তর। প্রত্যেকে।

প্রশ্ন। মৃত্যুর কারণ ?

উত্তর। জন্মাতে না পারা। (আমার দাদামশায়ই এজন্য একমাত্র দায়ী।)

প্রশ্ন। দাদামশাই কি মারা গেছেন না বেঁচে আছেন ?

উত্তর। মামাদের জিজ্ঞেস করুন।

প্রশ্ন। পৈতৃক আদি নিবাস কোথায় ছিল ?

উত্তর। আর্যাবর্তে।

প্রশ্ন। এপর্যন্ত কি কি অসুখ গেছে আপনার ?

উত্তর। শৈশবে বাত আর ডায়াবিটিসে ভুগেছি—অ্যাপেণ্ডিসাইটিসও হয়েছিল (আমার কুষ্ঠি থেকেই জানা যায়)। এখন বড় হয়ে হুপিংকাফ্, পেটকাম্ড়ানি, আর হামেশায় ভুগছি (হাম আমার প্রায়ই হয়।) তার ওপরে মাথায় জল জমে। এটাকে মাথার গোদও বলতে পারেন—ইচ্ছে করলে।

প্রশ্ন। ভাই-টাই ছিলো ?

উত্তর। সবশুদ্ধ তেরো জন।

প্রশ্ন। কজন জীবিত ?

উত্তর। প্রায় সবাই খতম্ (আমি এবং আরেকজন বাদে)।

প্রশ্ন। বোন টোন ?

উত্তর। বোনের কথা বল্‌বেন না। বোন নয়, অরণ্য। রীতিমত শ্বাপদসঙ্কুল। এবং তার Tone-এর কথা আর বলে' কাজ নেই।

প্রশ্ন। আয়ুক্ষয়কর কোনো বদভ্যাস কি আপনার আছে ?

উত্তর। আছে বই কি। নইলে গতাসু হবার উপায় কী ?

প্রশ্ন। নেশা টেশা করেন?

উত্তর। নিশ্চয়। কোন্‌টা না? নস্যি নিই, আফিং খাই। ধুতরোর বীচিও গিলে থাকি—হয়তো একটু বেশি পরিমাণেই। এছাড়া, গাঁজা টানি। দস্তুরমতো। (আমার যেকোনো লেখা পড়লেই তার প্রমাণ পাবেন।) এবং কেউ যদি আমাকে পটাসিয়াম্‌ সাইনাইড নিয়মিত ভাবে যোগাতে পারে—তাহলে ওটাও পরখ্‌ করে' দেখার আমার সখ্‌ আছে।

এইরূপ উত্তরসহ আবেদনপত্র পাঠিয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। নিশ্চিত ছিলাম তিনমাসের প্রিমিয়ম্‌ যে ৩৫০৲ টাকা ঐসঙ্গে পাঠিয়েছি পত্রপাঠ তা ফেরৎ আসবে। আমার জবাব দেখেই আমাকে তাঁরা জবাব দেবেন, আর জবাই করবেন না।

বেশ ফুর্তিতেই ছিলাম—কিন্তু ওমা, আজকের ডাকে এইমাত্র যে চিঠিখানি এলো, তা আমাকে একেবারে বসিয়ে দিয়েছে—

"সনমস্কার নিবেদন, আপনার আবেদনপত্র এবং সেই সঙ্গে প্রিমিয়মের ৩৫০৲ টাকা পেয়ে আপনাকে আমাদের ধন্যবাদ জানাই। আপনার বিষয়ে সকল দিক বিবেচনা করে আমাদের বীমাবদ্ধ সাধারণ জীবনের তুলনায় আপনার জীবনকে প্রথম শ্রেণীর ঝুঁকি বলেই আমরা মনে করি।

আমাদের নিরাপদ বীমারুদের মধ্যে আপনাকে লাভ করে' আমরা সবিশেষ আনন্দিত। নিবেদন ইতি—"

চালানি
কারবার

চালের দ্বারা ভাত, মুড়ি, পোলাও এবং মাতব্বর হতে পারে, এমন কি টাকাওয়ালা লোক বলেও হয়তো নিজেকে চালানো যায়, কিন্তু চালিয়াতি সব জায়গায় খাটে না। সেটা টের পেলাম আবনগাঁয় গিয়ে। অনেকটা এগিয়ে, তারপরং।

ইঞ্জিনীয়ার রূপে নিজেকে চাল্‌তে গিয়ে যা বিপদে পড়েছি, বলবার নয়। নিজের চালে নিজেই মাৎ হবার যোগাড়। যাকে বলে, চালবাজিমাৎ!

মামা বল্লেন, "যা তো, আবনগাঁয় আমাদের কলোনির কাজটা কদ্দূর গড়ালো দেখে আয় গে!"

আমার দূরসম্পর্কের মেজমামা। বাংলাদেশের স্থানে অস্থানে পড়্‌তা জমি সস্তায় নিয়ে বাংলো প্যাটার্নের বাড়ীঘর বানিয়ে ফলাও করে কলোনি ফাঁদার ব্যবসায় নেমেছেন। পূর্ব বাংলার বাস্তুত্যাগীদের তাঁর কলোনির ফাঁদে ধরতে পারবেন এই ভরসায়। তিন বছরের মোট ভাড়া আর মোটা সেলামি মুটের মাথায় করে নিয়ে দলে দলে সেখানে এসে তারা জোট পাকাবে, এই শুধু তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কিন্তু তাদের আগমনীর আগে আমাকেই, নিজের ঘরদোর ছেড়ে, সেখানে গিয়ে জুটতে হোলো। আমিই তাঁর কলোনির কোলে গিয়ে ঢলে পড়লাম। আমিই গেলাম আগাম্‌।

কলোনি তখনো বাড়ন্ত। সবে জঙ্গল কেটে পত্তন হচ্ছে। খানাখন্দ বুজিয়ে, ইটের পাঁজা পুড়িয়ে. পথঘাটের ছক্‌ এঁচে ঘরবাড়ী পাতবার আয়োজন সুরু হয়েছে সবেমাত্র। এমন সময়ে, এই সব ব্যাপারের খবরদারি করার জন্য

একজন জবর লোকের দরকার হোলো মামার। ডাক পড়লো আমার।

আমি বল্লাম, "আমি লেখক মানুষ। তার ওপর আবার বাঙালী লেখক। বাংলাই ভালো জানিনে, বাংলোর আমি কী জানি!"

"যাচ্ছিস্ তো অজ পাঁড়াগাঁয়। সেখানকার তারা তোর চাইতেও কম জানে। তুই যে একটা দিগ্‌গজ্‌ তা তারা টেরই পাবে না।" মামা জানান্।—"টেরি বাগিয়ে চলে যা।" আমার ভাষাতেই তিনি আমায় ভাসিয়ে দিতে চান্।

"না—না—না-না-না-না—নান্—ন্না—মামা!" তবুও আমি গজ্‌গজ্‌ করি।

"যাঃ, আর না-না করিস্ নে। নানা কথা আমার ভালো লাগে না। আমি কাজের মানুষ। এক কথার মানুষ। আর এত ভয়ই বা তোর কিসের? কলোনিতে আছে তো কেবল জনকত জনমজুর, আর কুলী-কামিন্,—মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি এই সব; আর আছেন আমাদের ওভারসীয়ার—"

"তা থাক্। কিন্তু তাহলেও তারা আমার চেয়ে বেশি শিক্ষিত। মানে, তোমার ঐ বাড়ীঘর বানানোর বিদ্যাতেই—আমি বল্‌ছিলাম।" বাধা দিয়ে আমি বল্‌তে যাই।

কিন্তু মামা কানেও তোলেন না।—"চাল্ মেরে বেরিয়ে যাবি। আমার ভাগ্‌নে তুই। স্রেফ্ চাল্। ভালো বুঝিস্ নিজেকে ইঞ্জিনীয়ার বলে চালাস্ না হয়।"

"ইঞ্জিনীয়ার? ইঞ্জিনীয়ার বলে চালাবো! তুমি বলো কী

মেজমামা ?" আমি অবাক্ হয়ে যাই : "চাল্‌কুম্‌ড়োকে কি আনারস বলে চালানো যায় ?"

"তা—নাহয়", মামা কথাটা পাল্‌টে নেন্ : "নাহয় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্রই হ'লি, খুব উঁচু ক্লাসের। তাহলেই তারা তোকে মাথা পেতে মেনে নেবে। খুব সমীহের চক্ষেই দেখবে সবাই। মায় আমাদের ওভারসীয়ার পর্যন্ত।"

কিন্তু তবুও আমার বুক দুর্‌দুর্ করে।—"কিন্তু আমি যে একেবারে আনাড়ি! কি করে ইঁটের পর ইঁট বসায়, এঁটে বসাতে হয়—তাও জানি নে।"

"মাঝে সুড়কি দিয়ে। আবার কী ? তাহলেই ওরা আপনি বসে যায়—সুড় সুড় করে—নেমন্তন্ন-বাড়ীর ফলারেদের মতন। পরীক্ষার হলে ছাত্রদের মতন। ওর আর এত জানাজানির কী আছে বাপু ?"

"তা জানি। তারপরে সিমেণ্টের কাজ, তাও জানা আছে। সব শেষে দেয়ালের চূণকাম, তাও আমার অজানা নয়। কিন্তু তাহলেও—" আমি আবার কাকুতি মিনতি করতে থাকি।

"আরে, য়্যাতো ঘাব্‌ড়াচ্ছিস্ কেন ? কথায় বলে বনগাঁয় শেয়াল রাজা—"

"কিন্তু তোমার এ তো বনগাঁ নয়, আবন্‌গাঁ।"

"তুইও তেমনি শেয়াল নোস্। যে রকমের ভীতু, তাতে শেয়ালেরাও তোকে দেখলে লজ্জা পাবে। তোকে খ্যাঁক-শেয়ালেরও অধম বলতে হয়।"

কথাটা আমার প্রাণে বাজলো। ভীতু! শোনার সঙ্গে সঙ্গে

সমস্ত ভয় উপে গেল আমার। আমি মরীয়া হয়ে উঠ্‌লাম। যাবো আবনগাঁয়ে—যা থাকে কপালে!

এলাম আবন্‌গাঁয়ে। চাল-চিঁড়ে বেঁধে। শেয়ালের মতো চালাক্‌ না হতে পারি, কিন্তু মামার শেয়াল-খোঁটা আমার মনে শেয়ালকাঁটার মতো বিঁধতে লাগলো। শৃগালের অধম হওয়ার মতো বিশ্রী গাল আর কী হতে পারে? আমি যে তা নই, তা যেকরেই হোক্‌, প্রমাণ আমায় করতেই হবে।

আসবার কালে মামা বলে দিয়েছিলেন—"আমাদের ওভার-সীয়ারের ওপর একটু নজর রাখিস্‌। বেশি কিছু তাকে বলতে হবে না, কেবল একটু নজর রাখলেই হবে।"

কিন্তু ওভারসীয়ার মানেই তো উঁচু নজরওয়ালা। তার ওপর নজর দিতে গেলে যতটা উদ্‌গ্রীব হতে হয় তেমন গলার জোর কি আমার আছে?

আর থাক্‌লেই বা কী! বেশি কিছু বলতে হবে না, বলেই দিয়েছেন মামা এদিকে।

বলেই বাঁচিয়েছেন বল্‌তে গেলে। নইলে, মামার কথার চালে ভুলে চালের কথায় নামলেই হয়েছিল আর কি! তাঁর কী, তিনি তো আমাকে বাস্তুবিদ্যার জাহাজ বানিয়ে চালান্‌ দিয়েই খালাস্‌। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ার—কিম্বা ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের উপ্‌রি ছাত্র হওয়া তো ইয়ার্কি নয়! চাট্টিখানি না? যে তা সাজে বা সাজতে যায়, শেষপর্যন্ত তার পক্ষেই সেটা সাজা হয়ে দাঁড়ায়।

সাজাই তার সার হয়, কথাটা একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্যি। আমিও হাড়ে হাড়ে তা টের পাচ্ছি এখন।

যাই হোক্, বেশি কথা আমি চালাতে যাই নি—কি ওভারসীয়ার আর কি অন্য কেউ—কারু কাছেই। পাছে আমার আসল বিদ্যে ফাঁস হয়ে যায় সেই ভয়ে। তা ছাড়া, যেখানে কথার কাজ নয়, কাজের কথা, সেখানে বাচাল হওয়ার বিপদ্ আছে। একটু বেচাল হলেই বান্‌চাল হতে হয়।

কিন্তু তাহলেও যথাসম্ভব কম কথায় আমার মাহাত্ম্য তাদের মনে দেগে দিতে চেষ্টার আমার ত্রুটি ছিল না। কলোনি গড়ার কলকাঠি আর কাণ্ড-কারখানা সবই যে আমার নখদর্পণে, কিছুই অজ্ঞাত নয়, এ তত্ত্বটা গর্ত খুঁড়ে আর পেরেক মেরে তাদের মাথায় পুঁতে দিয়েছিলাম। এমন কি, আমিই যে, ঠিক এখনই না হলেও, এই কণ্ট্রাক্টরী-ফার্মের অবশ্যম্ভাবী ইঞ্জিনীয়ার, ঠারে ঠোরে এ খবরটাও জানিয়ে দিতে কসুর করিনি। এবং সত্যি বলতে, হবু ইঞ্জিনীয়ারের দাপটে সবাই বেশ কাবু হয়েই ছিল। এমন কি, 'আমাদের' ওভারসীয়ার পর্যন্ত।

কলোনির চারধারে টহল দিতে সুরু করলাম। ওভারসীয়ার থেকে কুলী-মজুর তক্ সবার উপর কড়া নজর রাখা হ'লো। ইট, কাঠ, রাজমিস্ত্রি, লোহালক্কড় কিছুই আমার নজরানা থেকে নিস্তার পেল না।

কথাবার্তা কমই বলি। মামাও বলে দিয়েছিলেন, এবং নিজেও খতিয়ে দেখলাম, এ ক্ষেত্রে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। কেবল নজর দিয়ে যাই। ওধারে যাই, ওটা দেখি, এধারে

আসি, সেটাকে তাকাই। খুঁটিনাটি সব কিছুতেই খর দৃষ্টি রাখতে হয়।

বিজ্ঞের ভঙ্গীতে সমালোচকের চক্ষে সব কিছুই লক্ষ্য করি। আর নিখুঁৎ ভাবে দেখার মানেই হচ্ছে খুঁৎ ধরা। আমাকেও খুঁৎ খুঁৎ করতে হয়।

কিসের খুঁৎ কোথায় খুঁৎ কিছুই তার বলি না, কেবল কুটিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি আর খুঁৎ খুঁৎ করি।

তাতেই কাজ হয়। তার চোটেই কুলীমজুরেরা কাঁপতে থাকে। সবাই ঘাবড়ে যায়। রাজমিস্ত্রিরা পর্যন্ত কাহিল। এমন কি, ওভারসীয়ারের মত সুখী লোকও আমার নজরে পড়ে শুকিয়ে ওঠেন।

ইঁটের পাঁচীলটার কাছে দাঁড়িয়ে আমি ঘাড় নাড়ি। ক্রূর কটাক্ষে তাকিয়ে, কোথায় এর গলদ খুঁজে বার করার চেষ্টা করি। কিন্তু আমি কিছু কিনারা করবার আগেই যে সেটা বানাচ্ছিল সে সলজ্জভাবে এগিয়ে আসে। এসে বলে, "আজ্ঞে, ঠিকই ধরেছেন! পাঁচীলটা একচুল বেঁকে গেছে। ভেবেছিলাম কেউ ধরতে পারবে না। কিন্তু আপনি চোখা লোক, আপনার চোখ কি এড়াতে পারে? ধরেছেন ঠিকই। এটা আমি ভেঙে ফেলে নতুন করে বানাবো।"

'হ্যাঁ, তাই করো, তাহলেই ভালো হবে।" প্যাঁচার মত মুখে আমি ঘাড় নাড়লাম। আর বলেই সরে পড়লাম সেখান থেকে।

এমনি চলছিল। আর চলছিল মন্দ না।

চালাচ্ছিলাম ভালোই। চালকলা-বাঁধা বামুনের বংশে জন্মে,

চাল আর কলা এক করে কলাসম্মত করে চালানো এমন কিছু শক্ত নয়। কিন্তু হঠাৎ চাল ফেঁসে তাল পড়বার মতো হোলো। পড়লো আবার, এত আটঘাট বাঁধা, আমার আটচালাতেই।

বাজের মত পড়লো সেই তাল—আমার চালবাজির মাথায়। তাল সামলাতে এখন আমার প্রাণ যায়!

একটু আগেই ওভারসীয়ারবাবু এসেছিলেন, আমার কাছেই। এসে বল্লেন—"যদি আমার স্পর্দ্ধা বলে না মনে করেন তাহলে আমি একটা কথা নিবেদন করি।"

আমি ঘাড় তুলে তাকালাম। "যদি অনুমতি করেন তা হলেই বলি—" বল্‌তে গিয়ে তিনি থামলেন।

"বলে ফেলুন।" আমি বল্লাম।—"বাধা কী?"

"কথাটা হচ্ছে এই,—এই আমি বলতে চাই—" একটু আমতা আমতা করে অবশেষে তিনি ভাঙেন, "আমার লোক-জনদের আপনি প্রায় পাগল করে তুলেছেন। আপনি বড্ডো খুঁৎখুঁতে। অবশ্যি, আপনার মতো একজন বড় ইঞ্জিনীয়ারের পক্ষে তা হওয়া এমন কিছু নয়। সত্যি বলতে, যদি একটু সাহিত্য করে বলি, উপমা দিয়ে বলার অপরাধ যদি আমার মার্জনা করেন, তাহলে লেখকের ভাষায় বলি, স্বভাব-কবির মতো আপনিও একজন স্বভাব-ইঞ্জিনীয়ার। শৈশব কাল থেকেই আপনি একটি বাস্তু—বাস্তু—না, সেকথা বলছিনা, বলছি যে, হামাগুড়ি দেবার সময় থেকেই অপানি একটি বাস্তুবিদ্। তখন থেকেই ঘরবাড়ী গড়ার বিদ্যায় আপনার হাতে খড়ি। এ বিষয়ের ঐশ্বরিক প্রতিভা নিয়েই আপনি জন্মেছেন, কাজেই

আমাদের কাজকর্ম নিতান্তই কাঁচা বলে আপনার মনে হবে এটা এমন কিছু বিচিত্র নয়। এদিকে, আমাদের হচ্ছে হাতে কলমে শেখা, ঘষে ঘষেও শেখা বলতে পারেন। আমাদের কাজকর্মে দোষ-ত্রুটি যে থাকবেই এটা স্বাভাবিক। তেমন করে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে এখানে সেখানে অনেক গল্‌তিই আপনার নজরে পড়বে।"

আমি ঘাড় কাৎ করি। কাৎ হয়ে তার কাতরোক্তি শুনি। কিছু বলি না।

"একথা আমি বুঝি। কিন্তু আমার লোকজনেরা নিতান্তই নাবালক। বয়সের দিক্ দিয়ে আপনার দেড়া কি ডবোল হলেও, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করলে নিতান্তই তারা শিশু! আপনার অলোকসামান্য নির্মাণপ্রতিভার কাছে দুগ্ধপোষ্য ছাড়া আর কিছুই তাদের বলা যায় না। একেবারেই এরা আনাড়ি..."

আমি ঘাড় নাড়ি। ওভারসীয়ার বাবু বলতে থাকেন—"হ্যাঁ, আনাড়ি ছাড়া আর কী বলা যায় এদের? অবশ্যি, চেষ্টার এদের কোনো ত্রুটি নেই, কিন্তু আসলে এদের অভিজ্ঞতারই হয়েছে অভাব, মুস্কিল এইখানেই। দশ-পনের বছরের বেশি মিস্ত্রি-মজুরের কাজে এরা লিপ্ত আছে বলে মনে হয় না। অতএব, আপনি এদের একটু স্নেহের চক্ষে ক্ষমার চক্ষে দেখবেন, এই আমার বিনীত অনুরোধ।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়!" আমি জানাই: "আর আমার ধারণা আমি তা দেখেও থাকি। এখন বলুন তো, যদি আমি কোনো বিষয়ে ওদের কিছু সাহায্য করতে পারি—"

ওভারসীয়ার বাবু একটু হাসলেন।

"শুনে ভারী সুখী হলাম। সেই কথাই বলছিলাম। হ্যাঁ, আমিও ওদের সেই কথাই বলেছি। বলেছি যে আপনি নিজেই ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে, গড়ে পিটে কাজের মানুষ করে নেবেন। আমার মতে, শিক্ষাদানটা একেবারে গোড়া থেকে সুরু করলেই ভালো হয়, একেবারে ইঁট তৈরী থেকে। কি করে ইঁট বানাতে হয়, ইঁটের পাঁজা সাজায় কেমন করে—তারপর কি ভাবে ইঁটের পর ইঁট বসিয়ে দেওয়াল গেঁথে তুলতে হয়, কাল সকালেই আপনি ওদের সেসব হাতে কলমে শেখাবেন—এই কথাই আমি বলে দিয়েছি ওদের।"

শুনে অবধি আমার চক্ষু স্থির হয়ে আছে। ওভারসীয়ার বাবুটিকে যতটা নিরীহ গোবেচারি বলে মনে হয়, মালুম হচ্ছে, আসলে উনি মোটেই তা ন'ন। আমার পরিচালনার ওপরে এটা তাঁর একটা ওপর-চাল ছাড়া আর কী? কিন্তু তাঁর চাল-চলন যাই হোক্, এখন আমার জানবার এই যে, 'সহজ ইঁট প্রস্তুত-প্রণালী' এবং 'সরল গৃহনির্মাণ-পদ্ধতি' বলে কোনো বই কি আমাদের বাংলা সাহিত্যে আছে? আছে কিনা কেউ আমায় বলতে পারে? আর থাকলেও, এই রাতারাতি সাত তাড়াতাড়ি এখন তা আমি পাই কি করে?

আর, পাই কোথায়—এই অজ পাড়াগাঁ আবন্‌গাঁয়?

Call-কারখানা

কারখানা দু' রকমের। কাণ্ড-কারখানা আর কল-কারখানা। কল-কারখানাও আবার দু' রকমের হতে পারে কিন্তু সেটা বঙ্কিমের পাল্লায় পড়ার আগে আমার ইয়াদ্ হয়নি।

ইস্কুলের সেক্রেটারি বিনা নোটিশে খতম্ হয়ে রেনিডের মতো হঠাৎ এসে গেল ছুটিটা। বঙ্কিম বললে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কী হবে, চ তোদের বাড়ী যাই। তোকে একটা নতুন ধরণের খেলা দেখাব।

নতুন ধরণের খেলাই বটে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দেখলে বোঝাই যায় না—খেলোয়াড়টিকে অন্ততঃ। সত্যি, বঙ্কিম এত খেলাও জানে!

আমি বললাম—তাই চল্। বাবা আপিস গেছেন, তাঁর বসবার ঘরটা ফাঁকা। মা ঘুমুচ্ছেন তেতলায়, কেউ কোথ্থাও নেই। বেশ পিস্‌ফুল্ অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ার।

আমাদের বাড়ীর দোরগোড়ায় এসে বঙ্কিম বললে—তোদের বাড়ী টেলিফোন আছে তো রে?

"না। টেলিফোন করতে হলে আমরা পিসে মশায়ের বাড়ী যাই। এখান থেকে আধ মাইল। অন্য জায়গায় করলে পয়সা লাগে কি না।"

"সেখানকার অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ার কেমন? এই রকম পিস্‌ফুল?" বঙ্কিম জিজ্ঞেস করে।

"পিসে অবশ্যি এখন আপিসে। কিন্তু—তা বলে' মোটেই পিস্‌ফুল নয়।" আমি বলি: "বরং পিসিফুল বল্‌তে পারিস। আমার পিসী রাতদিন সারা বাড়ী চষছেন। তাছাড়া বাড়ীটা

হুর্দান্ত রকমের পিসতুত-ভাই-ফুল্। কাচ্চাবাচ্চা সব, কিন্তু কেউ তাঁরা হুপুরে ঘুমোয় না—আর যাকে বলে, আট্‌মোসট্‌ ফিয়ার। এক একটি ভয়াবহ আবহাওয়া।"

"তাহলে সেখানে গিয়ে কাজ নেই। আমাদের বাড়ীই চ'। আমাদের টেলিফোন আছে। তোকে চকোলেট খাওয়াব।" বঙ্কিম বল্‌ল।

টেলিফোনের জন্যে না, চকোলেটের খাতিরেই বঙ্কিমের বাড়ী গেলাম।

গিয়েই বঙ্কিম টেলিফোন নিয়ে বসলো—অবশ্যি, চকোলেটের বাক্স সামনে রেখে।

"খেলাটা হচ্ছে এই—," বঙ্কিম আমাকে বোঝাতে থাকে, "এই হচ্ছে টেলিফোন্। (টেলিফোন্‌টাকে ও পাকড়ায়) আর এর নাম, বুঝলি, রিসিভার—এম্‌নি করে' ধরতে হয়। (রিসিভারটাকে ও হাতায়) ধরে' এইবার আমি একটু চোখ বুজবো, একটা নম্বর আন্দাজ করব। যা মনে আসে—যে কোনো নম্বর। এই যেমন ধর্……"

চোখ বুজে রিসিভারটাকে কানে ধরে বঙ্কিম উদাহরণস্বরূপ হয়ে ওঠে।..."হ্যালো, বড়বাজার ৭০৭০ হ্যালো, আপনারা বড়-বাজার সত্তর সত্তর?...আপনি কে? দৌবারিক দাশ...মিষ্টান্ন বিক্রেতা?···ভালো কথা, আপনাদের দোকানে আজ কোনো পচা সন্দেশ আছে? নেই? সব পাচার করে দিয়েছেন? পাড়াতেই করেছেন তো?···বেশ বেশ!···ও, আমি? আমি আপনাদের পাড়ায় থাকি, পাড়ার ডাক্তার। ভালো করে কেন

এখনো কলেরা লাগছে না এখানে, সেইজন্যে ভারী ভাবিত আছি। খুব কসে পচা সন্দেশ চালান্ মশাই, বুঝলেন ? কদাপি টাট্‌কা থাকতে বেচবেন না, আগে পচ্‌তে দিন্—রীতিমতো পচুক—তার পর পচিয়ে ছাড়ুন। বুঝেচেন…"

বঙ্কিম দৌবারিককে ত্যাগ করলো।

"এই একটা দৃষ্টান্ত দিলাম। তেমন খুব ভালো দৃষ্টান্ত নয় যদিও। দোকানদারদের আমি পছন্দ করি না—পারতপক্ষে এড়িয়ে চলি। ওদের নিয়ে বিশেষ সুবিধে হয় না। ডোমেষ্টিক লোক পেলেই খেলাটা ভালো জমে। তবে কয়েকটা আজে-বাজে এই ভাবে যাবার পর এক একটা এমন মজার লোক কলে পড়ে তখন এসব—সমস্ত লোকসান পুষিয়ে যায়…কেমন, খেলাটা তোর কেমন লাগছে ?"

ওর কলের সময়ে আমার কেরামতি দেখাচ্ছিলাম। চকোলেটদের মুখে পুরছিলাম। ধ্বংসাবশেষটিকে গিলে বল্‌লাম—"মন্দ না। হাতে কোনো কাজ না থাকলে এক-আধ ঘণ্টা এই ভাবে কাটাবার পক্ষে ভালোই তো! অবশ্যি, বাবারা যদি টের না পায়। বিশেষ, আমার মত বাবা। দে, এবার আমি করি......"

হাতে-কলমে যেমনটি শিক্ষা পেয়েছি—কাজে লাগাই। রিসিভার কানে দিয়ে চোখ বুজতে হয়…আন্দাজ-মার্কা একটা নম্বরও বলে দিই......

"হ্যালো, এটা ইস্কুল ? দয়া করে—একটু অঙ্কের মাষ্টারকে ডেকে দেবেন...ক্লাসে গেছেন তিনি ? লাইব্রেরীতে কে

আছেন এখন? ইতিহাসের মাষ্টার? আচ্ছা, তাঁকেই ধরতে বলুন।"

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হোক্, আপত্তি কি?

"হ্যালো, মাষ্টার মশাই, আমার ছেলেকে আপনি যা পড়াচ্ছেন তা আর বলে কাজ নেই। এ রকম প্রাইভেট টিউশনি কদ্দিন থেকে করছেন মহাশয়? আমার ছেলেকে পড়াবার নামে যা ফাঁকি দিচ্ছিলেন—ছিঃ! সে-কথা আর বলে' কাজ নেই..."

"আজ্ঞে...আজ্ঞে...আপনি কী বল্‌ছেন?"

গলাটা বাবাসুলভ করে আমি বজ্রের মতো গর্জন করিঃ "আর আজ্ঞে আজ্ঞেতে কাজ নেই। এই আমার স্পষ্ট কথা, শুনে রাখুন। আপনাকে আজ থেকে আর আমাদের বাড়ী পড়াতে আসতে হবে না। পড়ানো তো ছাই, যা আমার ছেলের কাছে শুনছি, আপনি না কি তার ঘাড় ভেঙে আলুকাব্‌লি খান্, সিনেমা খ্যাখেন, তার পর তার জন্মদিনের পাওয়া ফাউণ্টেন পেনটাও এক দিনের জন্যে ধার নিয়ে জন্মের মত সাবাড় করেছেন—মেরে দিয়েছেন একেবারে—এ সব কী!"

অপর প্রান্ত থেকে এবার সন্দিগ্ধ কণ্ঠ শোনা যায়—"দেখুন, আপনার রং নম্বর হয়নি তো? আমি তো আপনাকে বা আপনার ছেলেকে ঠিক ধরতে পারছি না।"

"আর পারবেনও না। আজকের সন্ধ্যের গাড়ীতেই আমরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছি। মধুপুর সট্‌কে পড়ছি সটাং। আপনার মতো মাষ্টারের খর্পর থেকে বাঁচতে হলে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই। নমস্কার।"

টেলিফোন ছেড়ে বঙ্কিমের দিকে তাকালাম—"কী! কি রকম হোলো? প্রথম চেষ্টা হিসেবে নেহাৎ মন্দ হয়নি, কী বলো?"

বঙ্কিম ঘাড় নাড়লো—একটু যেন বাঁকা ভাবেই।

তারপর ওর পালা। ওর বরাতে একটা হোলো নো-রিপ্লাই, আরেকটা ফিরিঙ্গি মেম, যার কথার মাথা-মুণ্ডু বোঝে কার সাধ্যি—যদিও আমাদের বঙ্কিমও ইংরিজি বোলচালে কিছু কম যায় না—কিন্তু হলে কী হবে, ওর বিলিতি সাধু ভাষা মেমটার কানে ঢুক্‌লেও মগজে ঢুকলো কি না কে জানে! বঙ্কিম বিরক্ত হয়ে তাকে ছেড়ে দিলে। শেষ পর্যন্ত তার টেলিফোনে জুট্‌লো এক আর্দালি—আর্দালি কিম্বা চাপ্‌রাসী—সে তো স্পষ্টই ওর মুখের ওপর বলে বস্‌লো—"কেয়া বুর্‌বাক্‌কা মাফিক্ বাৎ কর্‌তা হ্যায়?"

এই ধরণের বাতচিতের পর বঙ্কিম ভারী দমে গেল। রিসিভার ছেড়ে দিয়ে গুম্ হয়ে বসে থাক্‌লো।

তখন আমি পাক্‌ড়ালাম। প্রথমেই পাক্‌ড়ালাম এক নাম-করা সাহিত্যিককে। উপন্যাস লিখতে তিনি ওস্তাদ। তাঁর উপন্যাসের কাঠামোর কোথায় কোন্ গলদ্ তাঁকে আমি অকাতরে জানালাম। আশ্চর্য, এর সমস্তই, তিনি বিনা বাক্য-ব্যয়ে মেনে নিলেন। কী ভাবে গল্প ফাঁদলে আরো ভালো হয় তারও কিছু কিছু হদিশ তাঁকে আমি দিলাম—পরবর্তী রচনায় সেগুলো তিনি কাজে লাগাবেন জানালেন আমায়।

বঙ্কিম তো গুম্ হয়ে ছিলোই, এখন আরো গম্ভীর হয়ে গেল। ওর মুখ কালো হয়ে উঠতে দেখলাম—আমার হিংসেয়, বলাই বাহুল্য।

কালো মুখে ও রিসিভারটাকে হাতে নিলো এবার। নিয়ে চোখ বুজলো। আমি সেই ফাঁকে ওর আরেকটা চকোলেটের বাক্স থেকে আরো কতকগুলো সরালাম। একেবারে আমার মুখের তল্লাটে সরিয়ে ফেল্লাম—ও চোখ বুজে থাকতে থাকতেই।

বঙ্কিমের ভাগ্যে এবার পার্ক ষ্ট্রীটের থানা এসে পড়লো। থানা শুনে আর সে এগুতে সাহস করলো না। "ওরে বাব্বা!" বলে রিসিভার রেখে দিলো—তৎক্ষণাৎ। বললো: "থানা ধরা ঠিক নয়। উল্টে থানাতেই ধরে নিয়ে যায়। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। বাঘকে ছুঁলেও তাই।"

আমি ধরলাম। আমার টেলিফোন্‌-জালে এবার এক জন লেডি ডাক্তার ধরা পড়লেন। ভালোই হোলো আরো। অনেক সদালাপের পর তাঁর কাছ থেকে মা'র অম্বলের ব্যামোর একটা পেটেন্ট দাবাই বাৎলে নিলুম—ফি-টি না দিয়েই—বেবাক্‌ বিনে পয়সায়। আমার সাফল্যের উপ্‌রি সাফল্যে এবং নিজের ব্যর্থতার পর ব্যর্থতায় বঙ্কিম ক্রমেই চট্টোপাধ্যায় হয়ে উঠছিলো। এবার সে চটে-মটে চকোলেটের বাক্সগুলো তুলে নিয়ে নিজের ড্রয়ারের মধ্যে বন্ধ করল।

বঙ্কিমটা ঐ রকম! বড্ডো হিংসুটে। অবশ্যি, আমি একটু বেশি বেশি চাখছিলাম তা ঠিক, তবু চকোলেটের এই বাজে খরচ—তাও হয়তো ওর প্রাণে সইতো। কিন্তু ওর খেলায় ওকেই হারিয়ে দেওয়া—এটা বুঝি কিছুতেই ওর বরদাস্ত হচ্ছিল না।

ক্রমেই ওর চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে এলো। ওর মুখে একটা ক্রূর হাসি খেলা করতে লাগলো। ওর ঠোঁটের কোণ বেঁকে

গেল। "এই বার শেষ বার—আমার পালা হয়েই খতম্।" এই বলে সে রিসিভারকে নিজের কানে লাগালো।

"ও—আপনি! ক'দিন থেকেই আপনাকে ফোন্ করব করব ভাবছিলাম—ভ্যগিস্ আপনাকে আজ পাওয়া গেল টেলি-ফোনে..."

বঙ্কিমের মুখে হাসি ধরে না। অনেক ধরাধরির পর কাউকে ধরতে পারলে কার না আনন্দ হয় বলো!

"...আপনার ছেলের স্বভাব-চরিত্রের কথা না বলে পারছি না। সমস্ত আপনাকে খুলে বলাই আমার উচিত। এই বয়সেই ওর স্বভাবের ভেতর য়্যাতো গলদ্ ঢুকেছে যে—আপনাকে বলব বলব মনে করেছি কিছু দিন থেকেই, কিন্তু—"

বঙ্কিম বলেই চলে। বল্তে বলতে মাঝে মাঝে আমার দিকে বঙ্কিম কটাক্ষে তাকায়। আমিও ওকে ইঙ্গিতে উৎসাহ দিই—চালাও—চালিয়ে যাও। খাসা চালিয়েছো।

বাস্তবিক, এমন ফলাও করে চমৎকার করে সুরু করেছে বঙ্কিমটা।

"...সিগ্রেট? হ্যাঁ, সিগ্রেট তো টানেই, বাণ্ডিল বাণ্ডিল বিড়ি ফুঁকে পার করে দিচ্ছে মশাই, সিগ্রেটের কথা কী বল্ছেন? সম্প্রতি আবার গাঁজা টানতেও সুরু করেছে। ...আজ্ঞে হ্যাঁ...আমাদের খোট্টা দারোয়ানের সঙ্গে। প্রথমে লোটা লোটা ভাঙ ওড়াচ্ছিল, তখন আমি তেমন কিছু মনে করিনি, ভেবেছিলাম এ বন্ধুত্ব বেশিদিন স্থায়ী হবে না, ভাঙের বন্ধুত্ব অচিরেই একদিন ভাঙবে। কিন্তু এখন দেখছি আমার ধারণা

ভুল। এখন তা গাঁজায় গিয়ে গড়িয়েছে। তাই আপনাকে খোলাখুলি সমস্ত জানাতে বাধ্য হলুম।..."

"...ইস্কুল? কোথায় ইস্কুল! ইস্কুলে দু'একটা ক্লাস করেই সে আমাদের দারোয়ানের আস্তানায় চলে আসে। এসে প্রাণ ভরে' গাঁজা টানে। এই তো এখনোও টানছে। সমানে টেনে চলেছে। আমার দোতলার পড়ার ঘরে বসে তার বিটকেল্ গন্ধ পাচ্ছি—নিজের নাকেই পাচ্ছি! এমন মাথা ঘুরছে কী বলবো! আপনি এক্ষুনি একটা ট্যাকসি নিয়ে চলে আসুন না—হাতে-নাতে ধরতে পারবেন ..."

"বাহাদুর! বাহাদুর!!" আমি মুক্তকণ্ঠে ওর প্রশংসা না করে পারি না।

"য়্যাঁ, কী বলছেন? কাজ ফেলে এখন আসতে পারা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়? তাছাড়া, অমন ছেলের আপনি আর মুখ দেখতে চান না? আজ বাড়ী ফিরলেই আপনি ওকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেবেন? তাড়িয়ে দেবেন বাড়ী থেকে? একেবারে—জন্মের মতই? তা আপনার ছেলে, আপনার যা খুসি, যেমন অভিরুচি—আপনি যা ভালো বোঝেন করবেন, আমি বলেই খালাস।..."

বঙ্কিম হাসিমুখে রিসিভার রেখে দিলো।

"ফাস্ কেলাস্!" আমি বলে উঠি, "একটা ছেলের দফা একেবারে রফা—জন্মের মতো সেরে দিয়েছিস্! আজ ইস্কুল থেকে বাড়ী ফিরে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে বেচারার জান্ যাবে..."

বঙ্কিম হাসিমুখে বলে—হুম্।

"বাপ্‌স ? অন্য কারো বাবা না হয়ে যদি আমার বাবা হোতো তাহলে যে কী দাঁড়াতো ভাবতেই আমি শিউরে উঠছি। আমি তো ভাই আস্ত থাকতুম না। আমার একটি কথা বলবার আগেই বাবা আমার হাড় এক জায়গায়, আর মাংস এক জায়গায় করে রাখতেন। সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা করে'। মাংসের কিমা দেখেছিস্‌ ? সেই কিমার মতই অনেকটা..."

"তাহলে জেনে রাখো," বঙ্কিম বাধা দিয়ে জানায়, "তোমার বাবাই ! তোমার বাবার আপিসেই এতক্ষণ আমি ফোন করছিলাম—আর কখনো আমার সাধের খেলা মাটি করতে আসবে ?"